হোয়াইট ফ্যাঙ

জ্যাক লণ্ডন

অনুবাদ করেছেন
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
২৪বি লেক রোড, কলিকাতা ২৯

এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা জ্যাক লণ্ডন ১৮৭৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়া রাজ্যের সানফ্রানসিস্‌কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান ;—লণ্ডন তাঁর সৎপিতার নাম, যাকে তাঁর মা বিয়ে করেন জ্যাকের বয়েস যখন মাত্র কয়েক মাস। জ্যাকের বাল্যকাল কাটে অশিক্ষায় অনাদরে, দারিদ্র্যের নিত্য নিপ্পেষণে। লেখাপড়া কিছুই হয়নি ছেলেবয়সে, তবে এলোমেলো বই পড়তে শিখেছিলেন অনেক,—আর আসল শিক্ষার পাঠ তিনি নিয়েছিলেন জীবন-বেদ থেকে, যে জীবনে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সুখ তিনি পাননি।

হোয়াইট ফ্যাঙ বন্য নেকড়ে। একেবারে নেকড়ে বললে ভুল হবে ;—কুকুরের রক্তও কিছুটা বইছে তার ধমনীতে। উত্তর-মেরু প্রদেশের তুষারঢাকা জনবসতিহীন অরণ্য রাজ্যে তার জন্ম, তার জীবনের পরিণতি মানুষের আশ্রয়ে, সভ্যতার নীড়ে। সোনার ব্যর্থ সন্ধানে লণ্ডন যখন ক্লনডাইক অঞ্চলে খনি খুঁড়ে খুঁড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার অনেক কিছু তিনি 'হোয়াইট ফ্যাঙ' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরই রচিত এই ধরণের আর একটি বইএর নাম 'দি কল অব্‌ দি ওয়াইল্‌ড্‌'। এ ছাড়া জ্যাক লণ্ডনের আর দুটি বিখ্যাত বই : 'সী উল্‌ফ্‌' ও 'আয়রন্‌ হীল্‌'।

জ্যাক লণ্ডন দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তিনি মারা যান ১৯১৬ খৃস্টাব্দে। তাঁর জন্ম যেমন রহস্যাবৃত তেমনি মৃত্যুও। অনেকেরই সন্দেহ, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

পুস্তকটি চার খণ্ডে ভাগ করা—আঁধার তুষার দেশ, আরণ্যক, শয়তানের ভর, ও সভ্যতার নীড়।

অনুবাদক

বাসন্তী আর রাখীকে

নতুন-কাকা

আঁধার তুষার দেশে

মাংসের সন্ধানে

বরফ-জমা শীর্ণ নদীপথের দুধারে গম্ভীর ভ্রূকুটিতে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যের কৃষ্ণ কংকাল। ঝড় হয়ে গেছে সম্প্রতি, খসে পড়েছে তুষারের সাদা আস্তরণ, একে অপরের গায়ে হেলে দাঁড়ানো কালো কালো খাড়া গাছের দল আসন্ন প্রদোষে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে স্তব্ধতার রাজ্য। সব ফাঁকা যেদিকে তাকাও, প্রাণহীন, স্পন্দনহীন,—এত নিঃসঙ্গ আর ঠাণ্ডা যে বিষণ্ণতার ভাবও হার মানে। কারুণ্য নেই, বরং চারিদিকে কোথায় যেন একটা হাসির ইশারা রয়েছে,—সে হাসি দুঃখের চেয়েও কঠোর, স্ফিংসের হাসির মতো সে হাসি নিরানন্দ, তুষারের মতো সে হাসি শীতল, ভাগ্যের মতো ভয়ংকর। অনাদ্যন্ত কালের ভাষাহীন বিপুল প্রজ্ঞা যেন জীবন আর সমস্ত জীবন-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। নিষ্প্রাণ উত্তরমেরু প্রদেশের তুহিন-শীতল রুক্ষ বুক থেকে বুঝি এই অদ্ভুত হাসি উঠছে।

কিন্তু হার মানে না জীবন। জীবনের দুর্দমনীয় অভিযান চলেছে এখানেও। বরফ-জমা নদীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে এক সার বন্য কুকুর। তাদের গায়ের খাড়া খাড়া ঝাঁকড়া লোমে বরফ জমেছে। তাদের মুখ থেকে নিঃশ্বাস বার হয়েই ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, আর সেই বাষ্প তাদেরই গায়ে এসে পড়ে তুষাররেণু হয়ে আটকাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের গায়ে চামড়ার বল্গা, পিছনে চামড়া দিয়ে বাঁধা একটা স্লেজ গাড়ি। স্লেজটার নিচে 'রানার' নেই, মোটা বার্চ কাঠের তৈরি সমস্ত গাড়িটার ভার বরফের ওপর। স্লেজের সামনের দিকটা উঁচু

হয়ে আছে, ঢেউ তোলা তুষার কাটতে কাটতে এগোচ্ছে। স্লেজের ওপর সরু লম্বাটে ধরণের একটা বড়ো বাক্স, শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কয়েকটা কম্বল, একটা কুঠার, রান্নার সরঞ্জাম, এ সব রয়েছে,—তবে গাড়িটার প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়েই ঐ লম্বা বাক্সটা।

কুকুরগুলোর সামনে তাদেরই সমান পরিশ্রম করে গাড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে একটা মানুষ। আর একটা মানুষ সমান পরিশ্রমে ঠেলছে পিছনে। তৃতীয় মানুষটা শুয়ে আছে স্লেজের ওপর বাক্সটার মধ্যে; তার পরিশ্রমের শেষ হয়েছে, মেরুপ্রকৃতি তাকে খতম করেছে, পরাস্ত করেছে শেষ পর্যন্ত,—আর সে নড়বে না। মেরুর ধর্ম গতি নয়, নিথরতা। জীবনের প্রতি মেরু বীতরাগ, কেননা জীবন মানেই গতি। মেরু চায় গতিকে বিনাশ করতে। জল পাছে তরঙ্গ হয়ে সমুদ্রে ছুটে চলে, তাই জলকে সে জমায়। বৃক্ষ আকাশে শাখা মেলে, তাই উদ্ভিদের রসকে সে শোষণ করে নেয়। সবচেয়ে নৃশংসভাবে সে নিষ্পেষিত পরাস্ত করে মানুষকে,—এর কারণ মানুষ প্রাণের আবেগে চিরচঞ্চল, মানুষ গতিহীন জড়তার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে চলমানতার বিদ্রোহ করে চলেছে।

এখানেও চলেছে দুটি মানুষ,—স্লেজের একজন সামনে একজন পিছনে। দৃঢ় পায়ে অকুতোভয়ে চলেছে আর চলেছে। গায়ে তাদের পাতলা চামড়া আর মোটা পশমের পোষাক। নিঃশ্বাস-জমা দানা বাঁধা তুষারে তাদের গাল ঠোঁট আর ভ্রূ এমনই আচ্ছন্ন যে মুখ চেনার উপায় নেই। দেখে মনে হয় দুটি যেন ভৌতিক মূর্তি—এক বিচিত্র জগতের প্রেতকৃত্যের শবাধারবাহক। কিন্তু মানুষ তারা এই জগতেরই। দিকচক্রবাল জুড়ে এই যে প্রাণহীন শব্দহীন বিস্তার, সৃষ্টির প্রতি এই যে সীমাহীন ব্যঙ্গ, এখানে তারা দুই নির্ভীক অভিযাত্রী; যেখানে সর্ব পরিচয় বিলুপ্ত, যেখানে নাড়ীর

আদিম স্পন্দন স্তব্ধ, স্থান-পরিধির সেই অনন্ত গহ্বরে কোন্ বিরাট বিস্ময়ের তারা সন্ধানী।

নির্বাক্ তারা চলেছে, কথা বলার ক্লান্তিকে পরিহার করে। চতুর্দিকের স্তব্ধতা যেন বিরাট মূর্তি নিয়ে চেপে ধরছে তাদের। চারদিকের জল যেমন ডুবুরিকে চেপে ধরে তেমনি এই নৈঃশব্দ্য তাদের চেতনাকে চাপ দিচ্ছে অসীম ভারে। আঙুর থেকে যেমন রস নিংড়োয়, তেমনি করে তাদের মন থেকে নিংড়ে গেছে সমস্ত মিথ্যা উত্তেজনা আর আকাংক্ষা, আত্মগর্বের সমস্ত ভ্রান্তি। তারা এইটুকু খাঁটি উপলব্ধি করেছে যে এই অন্ধ প্রকৃতির বিচিত্র বিরাট উচ্ছ্বাসের মাঝখানে তারা শক্তিহীন, তারা সামান্যতম কীটানুকীট, দুর্বলতম কৌশল আর ক্ষীণতম বুদ্ধি নিয়ে তারা কোনোরকমে তবু নড়ছে।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর আরো এক ঘণ্টা। সূর্যহীন হ্রস্ব দিনের পাণ্ডুর আলোক ম্লান হয়ে এল। এমনি সময়ে হঠাৎ স্তব্ধ আকাশে ভেসে এল অস্পষ্ট একটা চিৎকার। হঠাৎ যেন তীব্র ক্ষীণ আর্তনাদ একটা উঠল, আস্তে মিলিয়ে গেল একটু পরে। এ যেন কোন্ পথভ্রষ্ট আত্মার কান্না; কিন্তু চিৎকারের মধ্যে রয়েছে কেমন একটা করুণ তীব্রতা, ক্ষুধার্ত আকুতি। সামনের লোকটি পিছনের লোকটির দিকে তাকাল, কাঠের বাক্সটার ওপর দিয়ে দুজনের দৃষ্টি একসঙ্গে মিলল; একটু মাথা নাড়ল দুজনেই।

আবার উঠল দ্বিতীয় আর্তনাদ সূচীভেদ্য তীব্রতায়। দুটি লোকই ধরতে পারল শব্দটা কোথা থেকে আসছে। পিছন থেকে,—যে তুষাররাশি তারা এইমাত্র পার হয়ে এসেছে তার কোনো একটা অঞ্চল থেকে। পিছনে বাঁদিক থেকে আর একটা আর্তনাদ উঠে যেন আগের চিৎকারের উত্তর দিল।

সামনের লোকটি বললে,—বিল্, ওরা পেছনে লেগেছে।

তার গলার স্বর ভাঙা ভাঙা, অস্বাভাবিক,—কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

পিছনের লোকটি বললে,—হ্যাঁ, মাংস কোথাও মিলছেনা কিনা! কতোদিন যে একটা খরগোসের চিহ্নও চোখে পড়েনি।

আর কথা তারা বাড়াল না। চলতে চলতে কান খাড়া করে শুনতে লাগল সেই অদ্ভুত আর্ত চিৎকার বারে বারে উঠছে, তাদের অনুসরণ করে চলেছে।

অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল তখন লোক দুটি নদীপথের ধারে এক-গুচ্ছ ঝাউ গাছের আড়ালে কুকুরগুলোকে জড়ো করে রাত্রের মতো তাঁবু খাটাল। আগুনের ধারেই কাঠের কফিনটা পাতল, সেটা হোলো তাদের বসার আসন। অদূরে কুকুরগুলো ছুটোপুটি আর গর্জন করতে লাগল, তবে কোনো কুকুর যে অন্ধকারে সরে পড়তে চাইবে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বিল্ বললে,—আমার মনে হচ্ছে, হেনরি, ওরা তাঁবুর খুব কাছাকাছিই কোথাও আছে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে আগুনের ওপর কফির পাত্রটা একটা বরফের টুকরো ঠেস দিয়ে সোজা করে বসাতে বসাতে হেনরি মাথা নাড়ল। তারপর কফিনের ওপর চেপে বসে খেতে আরম্ভ করে উত্তর দিল,—কিছু ভেবো না। কুকুরের বুদ্ধিও কম নয়। ওরা সাবধান হতে ঠিক জানে,—খাবে কিন্তু খাবার খোরাক হবে না।

বিল্ মাথা নাড়ল, বললে,—কী জানি!

হেনরি চোখ কুঁচকে তাকাল বিলের মুখের দিকে, বললে,—কুকুরের বুদ্ধিতে সন্দেহ? তোমার মুখে প্রথম শুনলাম!

সযত্নে বরবটি সিদ্ধ চিবোতে চিবোতে বিল্ বললে,—হেনরি, কুকুরগুলোকে যখন খাওয়াচ্ছিলাম তখন ওরা কীরকম মারামারি করছিল দেখেছিলে?

খুব বেশি নাকি ? হ্যাঁ, তা একটু বাড়াবাড়িই করছিল বটে ! হেনরি স্বীকার করল।

বিল্ প্রশ্ন করল,—হেনরি, আমাদের কুকুর কটা ?

কেন ? ছটা।

শোনো তবে। বিল্ একটু থেমে গলাটা গম্ভীর করে বললে,—ঠিক বলেছ তুমি, ছটা। ব্যাগ থেকে ছটা মাছ বের করে আমি প্রত্যেককে একটা একটা করে দিলাম। কিন্তু একটা মাছ কম পড়ল।

ভুল গুনেছ তুমি।

ছটা কুকুর আমাদের, নিষ্প্রাণ গলায় বিল্ বলতে লাগল,—ওদের খাবার জন্যে মাছও আমি নিয়েছিলাম ছটাই। এক-কানটার ভাগ্যে কিন্তু মাছ জুটলনা। আমি আবার ব্যাগ থেকে আর একটা মাছ বের করে তবে ওকে দিলাম।

কিন্তু কুকুর তো আমাদের ছটার বেশি নেই !

কুকুরই হোক আর যাই হোক, মাছ খেয়েছে সাতজনায় একথা তোমাকে বলে দিলাম।

হেন্‌রি খাওয়া বন্ধ করে কুকুরদের দিকে তাকিয়ে গুনতে লাগল। বললে,—ছ্যাখো, ছটাই।

বিল্ দৃঢ় গলায় বললে,—আমি আর একটাকে দেখেছি বরফের ওপর দিয়ে পালিয়ে যেতে। তখন ছিল সাতটা।

করুণ দৃষ্টিতে হেনরি বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর শুধু বললে,—এ যাত্রাটা শেষ হলে বাঁচি।

তার মানে ?

তার মানে তোমার নার্ভ বিগড়েছে, আর বইতে পারছে না,—তুমি ভুল দেখতে শুরু করেছ।

গম্ভীর গলায় বিল্ উত্তর দিলে,—আমিও তা যে ভাবিনি তা

নয়। তাই সেইটে যখন বরফের ওপর দিয়ে পালাল, আমি তার পায়ের ছাপও লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি করে কুকুরগুলোকে গুনলাম। ছটাই। বরফের ওপর পায়ের ছাপ এখনো আছে। দেখবে?

হেনরি উত্তর দিল না, নিঃশব্দে খাবার চিবুতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে সে একবাটি কফি চুমুক দিয়ে শেষ করল। তারপর হাতের পিছন দিক বুলিয়ে মুখ মুছে বললে,—তাহলে তোমার ধারণা যে ওটা হচ্ছে—

হঠাৎ অন্ধকারে কোথা থেকে আবার উঠল বীভৎস করুণ আর্তনাদ। কথা বন্ধ করে হেনরি শুনল সেই ডাক। তারপর সেই শব্দের দিকে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করে কথা শেষ করল,—ওটা হচ্ছে ঐ ওদেরই একটা?

বিল্ মাথা নাড়ল।—নিশ্চয়ই, আমি বাজি রাখছি। কুকুরগুলো তখন কী দারুণ চেঁচামেচি করছিল মনে নেই?

রাত্রি বাড়তে লাগল। অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেদ করে উঠতে লাগল চিৎকারের পর চিৎকার, ডাক আর তার উত্তর, এদিক ওদিক সবদিক থেকে। কুকুরগুলো ভয়ে এ-ওর গায়ে জড়াজড়ি করে রইল, আগুনের এত কাছাকাছি তারা ঠেলে এল যে গরমে মাঝে মাঝে তাদের গায়ের রোঁয়া ঝলসে যেতে লাগল। বিল্ আগুনে আরো খানিকটা কাঠ চাপিয়ে পাইপটা ধরাল।

হেনরি বললে,—যাই বলো, তুমি কিন্তু বড্ডো মুষড়ে পড়েছ।

হেনরি,—পাইপ মুখে ভাবতে ভাবতে বিল্ বললে,—আমি কি ভাবছি জানো? তোমার আমার চাইতে এই লোকটার ভাগ্য কত্তো ভালো!

যে বাক্সটার ওপর ওরা বসেছিল আঙুল দিয়ে তার ডালাটা বিল্ ঠুকল। তৃতীয় ব্যক্তি বাক্সটার মধ্যে।

তুমি আমি যখন মরব, তখন কুকুরে নেকড়েতে আমাদের ছিঁড়ে খাবে। ওদের মুখ থেকে বাঁচাতে দেহের ওপর কয়েকটা পাথর যদি জোটে, সেই হবে সবার বড়ো বরাত।

তা, এ লোকটার মতো লোকবলও আমাদের নেই, টাকাকড়িও নেই, দূরদুরান্তে গিয়ে কবরস্থ হব, সে বিলাসিতা কি আমাদের পোষাবে?

আমার ধাঁধা লাগছে কিসে জানো? এই যে লোকটা, নিজের দেশে মস্ত জমিদার, টাকাকড়ি মানসম্মানের অন্ত নেই, জীবনে কখনো অন্নবস্ত্রের দুঃখ কাকে বলে টেরও পায়নি। এর কী মাথা ব্যথা পড়ল দুনিয়া-ছাড়া এই বরফের রাজ্যে এসে মরতে?

হেনরি স্বীকার করল,—সত্যি, ঘরে বসে থাকলে পাকা বুড়ো হতে পারত ঠিক।

বিল্ কথা বলতে মুখ খুলেই কী ভেবে চুপ করে গেল। চারদিকের চাপ-ধরা অন্ধকারের দিকে সে হাত বাড়িয়ে খালি দেখাল। যেদিকে তাকাও ঘন কালো, কোনো ছায়ার কোনো রেখার ইশারা নেই সেই অটুট কালোর মধ্যে। কেবল দূরে জলন্ত কয়লার মতো জলছে চকচকে একজোড়া চোখ। হেনরি আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখাল, আরো এমনি জলজলে চোখ—দ্বিতীয় জোড়া, তৃতীয় জোড়া। তাঁবুর চারদিকে অদূরের অন্ধকারে তাদের ঘিরে রয়েছে এইসব চোখের দল। কখনো এক এক জোড়া চোখ নিবছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, এক মুহূর্ত পরে আবার ধ্বক ধ্বক করে জলে উঠছে।

কুকুরগুলোর অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। হঠাৎ আতংকের একটা দমকায় ওরা একেবারে আগুনের কাছাকাছি ছুটে এল, মানুষ

দুজনের পায়ের ফাঁকে জড়াজড়ি করে এসে পড়ল। হুটোপুটির মধ্যে একটা কুকুর গড়িয়ে পড়েছিল একেবারে আগুনের মধ্যে, সে ভয়ে আর যন্ত্রণায় কাৎরাতে লাগল, বাতাস ভরে গেল পোড়া লোমের গন্ধে। হুটোপুটির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের চোখের গণ্ডী কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছিয়ে গেল, তারপর কুকুরগুলো শান্ত হতে চোখের পাহারাও আবার এগিয়ে এসে স্থির হয়ে জমল।

বরাতটা দেখেছ হেনরি? গুলি যদি ফুরিয়ে না যেত!

পাইপ খাওয়া শেষ করে বিল্ বন্ধুর সঙ্গে বিছানা পাতছিল। বরফের ওপর ঝাউপাতা বিছিয়ে তার ওপর লোমশ কম্বল পাততে পাততে সে দুঃখপ্রকাশ করল। হেনরি একটা অস্ফুট শব্দ করে জুতো খুলতে লাগল। তারপর বললে,—কটা কার্তুজ আর আছে?

তিনটে। কী হবে তিনটেয়? তিনশোটা দরকার। তাহলে দেখে নিতাম শয়তানগুলোকে।

জ্বলন্ত চোখগুলোর দিকে রাগে একবার ঘুসি বাগিয়ে সে আগুনের ধারে জুতোটা গুছিয়ে রাখল।

আবার সে বললে,—আর এই জঘন্য ঠাণ্ডাটা যদি কমত। দু সপ্তাহ ধরে পঞ্চাশ ডিগ্রীর নিচে ঠাণ্ডা জমে আছে। আর ধরো এবারের এই যাত্রাটা থেকেও যদি রেহাই পেতাম। তুমি ঠিক বলেছ হেনরি, আমার কেমন ভালো লাগছে না। কেবল ভাবছি এই বুঝি তুমি আমি ম্যাক্‌গারিতে দিব্যি আগুনের ধারে বসে তাস্ পিটছি!

হেনরি আর একবার হুঁ দিয়ে বিছানায় লম্বা হল। প্রায় ঝিমুনি তার এসেছে এমন সময় সে শুনল বিল্ আবার কথা বলছে,—হেনরি, আচ্ছা বলো তো, ঐ…ঐ যেটা এসে মাছ খেয়ে গেল, কুকুরগুলো

ওকে কামড়ে শেষ করল না কেন? কুকুরগুলো ছেড়ে দিল? ভারি আশ্চর্য নয়?

তন্দ্রাচ্ছন্ন উত্তর এল,—বড়ো বাজে তুমি ভাবো বিল্! এমন তো আগে ছিলে না। চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়, নইলে সকালে ঠেলা বুঝবে। তোমার পেটের গোলমাল হয়েছে।

একটা কম্বলের নিচে শুয়ে দুই বন্ধু ঘুমিয়ে পড়ল, পাশাপাশি পড়তে লাগল তাদের ভারি নিঃশ্বাস; আগুন কমে এল। গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল চোখের দল। কুকুরগুলো ভয়ে আরো জড়সড় হয়ে এল, মাঝে মাঝে খুব কাছে এগিয়ে আসা এক এক জোড়া চোখের দিকে চেয়ে ভয় আর রাগ মেশানো গর্জন করে উঠতে লাগল। একবার তাদের আর্ত গর্জনে বিলের ঘুম ভেঙে গেল। পাছে বন্ধুও জেগে ওঠে তাই খুব সাবধানে সে উঠে বসল, আগুনে আরো কয়েকটা কাঠ ফেলে দিল। অগ্নিশিখা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টির গণ্ডীও দূরে সরল। গুঁড়িসুড়ি হয়ে রয়েছে কুকুরগুলো। তাদের দিকে চোখ পড়তেই বিল্ তাড়াতাড়ি দু হাতে দু চোখ কচলাল। ভালো করে কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে সে আবার ঢুকল কম্বলের তলায়।

বন্ধুর কানের কাছে ডাকতে লাগল বিল্,—হেনরি, হেনরি!

উঁ, চমকে জেগে হেনরি বললে,—কী হোলো আবার?

কিছু না, বিল্ বললে,—কুকুরগুলো আবার দেখছি সাতটা, ছটা নয়। আমি গুনে দেখলাম এই মাত্র।

হেনরি আর একবার 'হুঁ' বলে ঘুমে তলিয়ে গেল, নাক ডাকতে লাগল তার।

ভোরবেলা হেনরিরই ঘুম ভাঙল আগে। বন্ধুকে সে ডেকে তুলল। ছটা বেজেছে তবু দিনের আলো ফুটতে এখনো ঘণ্টা তিনেক দেরি। অন্ধকারেই দুজনে কাজ সুরু করল। হেনরি প্রাতরাশ বানাতে

লাগল। বিল্ বিছানাপত্র তুলে স্লেজ গাড়িটা ঠিক করতে লাগল।

হঠাৎ বিল্ ডাকল,—আরে হেনরি, কুকুর কটা?

ছটা।

বিল্ যেন জয়গর্বে চেঁচিয়ে উঠল,—ভুল।

হেনরি বললে,—কেন, সাতটা হোলো আবার?

না, পাঁচটা। একটা গেছে।

কী কাণ্ড! হেনরি রান্না ছেড়ে স্লেজের কাছে এসে কুকুরগুলো গুনল। ঠিক বলেছে বিল্, মোটকাটা সরেছে।

হুঁ, কাণ্ড ছাখো তো! কখন সরে পড়ল আগুনের ধোঁয়ায় চোখেও পড়ল না? আওয়াজও করল না একটা?

কী করে করবে? ব্যাটারা ওকে আস্ত গিলেছে, জ্যান্ত অবস্থায় গলার মধ্যে যখন ঢুকছে, তখন হয়তো কেঁউ কেঁউ করেছিল।

বিল্ বললে,—মোটকাটা বোকাও ছিল চিরটা কাল।

কিন্তু এমন বোকা, যে সেধে দল ছেড়ে চলে গিয়ে আত্মহত্যা করবে? হেনরি বাকি কুকুরগুলোকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। এদেরও প্রত্যেকের প্রকৃতি সে জানে। বললে,—নাঃ আর কেউ এমনি বোকামি করবে না।

বিল্ বললে,—ঠিকই তো। এদের তো লাঠির বাড়ি মেরেও আগুনের কাছ থেকে সরানো যায় না। মোটকাটা সত্যিই যেন কেমন ধারা ছিল। মরুক গে!

উত্তরমেরু প্রদেশের একটা কুকুর মরল,—এইটুকুর বেশি শোকাচ্ছ্বাস তার জন্যে কে করবে? তুষাররাজ্যের দিন ফুরুলে এর বেশি একটা কুকুর কী আর দাবী করবে? একটা মানুষ মরলেই বা এর বেশি কী পায় এ রাজ্যে?

মাদী নেকড়ে

প্রাতরাশ শেষ করে তাঁবুর সামান্য মালপত্র স্লেজগাড়িতে তুলে মানুষ দুটো আবার যাত্রা করল সামনের অন্ধকারে। পিছনে পড়ে রইল মিষ্টি লাল আগুন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাক বেড়ে উঠল—হিংস্র করুণ ডাক—অন্ধকার আর ঠাণ্ডার বুক চিরে কান্নার মতো চিৎকারে এ ওকে ডাকছে, উত্তর দিচ্ছে। মানুষদেরই কথাবার্তা বন্ধ। নটার সময় 'দিনের আলো ফুটল। দ্বিপ্রহর বারোটায় দক্ষিণের আকাশ গোলাপী আভায় আরক্ত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। দিগন্তের রক্তিমাভা কিছু পরেই মিলিয়ে গেল, তিনটে পর্যন্ত আকাশ জুড়ে রইল ধূসর আলোছায়া। তারপরে সে ঝাপসা আলোও ফুরুলো, শব্দহীন সঙ্গহীন মেরুরাজ্যে আর্টিক রাত্রির কালো পর্দা নেমে এল ধীরে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্লেজের আশেপাশে বুভুক্ষু চিৎকারও ঘনিয়ে এল, মাঝে মাঝে সে চিৎকার এত কাছাকাছি আসছিল যে কুকুরগুলো আতংকে ছটফট করে উঠছিল।

এমনি একবার ভীষণ ভয় পেয়ে স্লেজের কুকুরগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তাদের আবার কাছাকাছি টেনে এনে সাজাতে সাজাতে বিল্ বললে,—আর পারিনে! ব্যাটারা কোথাও যদি শিকার পেত, আমরাও নিস্তার পেতাম তাহলে!

হেনরি সমবেদনার সঙ্গে বললে,—সত্যি, চিৎকারে চিৎকারে পাগল করে দিল!

রাত্রের মতো তাঁবু গাড়ার আগে পর্যন্ত আর কোনো কথা তারা বলল না।

আগুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুটন্ত বরবটি-সেদ্ধর পাত্রে আরো কয়েকটা বরফকুচি ফেলছে এমন সময় হেনরি হঠাৎ চমকে উঠে

দাঁড়াল। একসঙ্গে তার কানে এল আঘাতের একটা ভারি শব্দ, বিলের গলার চিৎকার আর কুকুরদের দলের মধ্যে থেকে যন্ত্রণার একটা বাধা বন্য আর্তনাদ। খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল, বরফের ওপর দিয়ে ছুটে অদূর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ধূসর একটা ছায়ামূর্তি। তারপরে তার চোখ পড়ল সঙ্গীর দিকে। আধা বিস্ময় আর আধা সাফল্য নিয়ে বিল্ দাঁড়িয়ে আছে কুকুরগুলোর মাঝখানে, এক হাতে তার একটা মোটা লাঠি, অপর হাতে রোদে শুকনো সামন্ মাছের ল্যাজার একটা টুকরো।

মাছটার আর্ধেকটা সাবড়ে দিয়েছে ব্যাটা, তবে এক ঘা লাঠিও কষিয়েছি ঠিক পিঠে। চিৎকার শোনো নি?

চেহারাটা কেমন? হেনরি প্রশ্ন করলে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে চারপেয়ে তো?—আর মুখ আর লোম দেখে মনে হোলো কুকুরেরই মতো।

আমার মনে হয় পোষা নেকড়ে।

হ্যাঁ, পোষা না আবার? নইলে ঠিক খাবার সময়টা এসে জোটে আর ভাগের মাছটি মেরে নিয়ে সরে পড়ে!

সেরাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে দুজনে যখন কাঠের লম্বা বাক্সটার ওপর পাইপ ধরিয়ে বসল তখন অন্ধকারে জ্বলন্ত চোখের ঝাঁক আরো কাছে ভিড় করে এসেছে।

বিল্ বললে,—উঃ, একপাল সাদা হরিণের শিকার যদি এখন মিলত, হতভাগারা মুক্তি দিত আমাদের।

মিনিট পনেরো দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ বসে রইল। হেনরি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে, বিল্ দেখতে লাগল ঠিক অগ্নিকুণ্ডের ওপারে অন্ধকারে ক্ষুধার্ত চক্ষুর দল ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে।

বিল্ আবার সুরু করল,—ওঃ, এই মুহূর্তে যদি ম্যাক্‌গারিতে পৌঁছতে পারতাম!

থামাও তোমার কাঁদুনি, ধমক দিয়ে উঠল হেনরি,—কেবল এ যদি হোতো আর ও যদি হোতো। কাল থেকে বলছি তোমার পেটটা ঠিক নেই। কেবল অম্বলের বকবকানি। সোডা খাও দিকি এক চামচ!

পরদিন সকালবেলা বিলের দারুণ চেঁচানিতে হেনরির ঘুম ভাঙল। উঠেই শুনল সে পাগলের মতো গাল পাড়ছে। কনুইএর ওপর ভর করে মাথা উঁচু করে হেনরি দেখল বিল্ আগুনটা আবার উস্কে দিয়েছে, কুকুরগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু হাত তুলে সে চেঁচাচ্ছে, অদ্ভুত উত্তেজনায় বেঁকে গিয়েছে তার মুখ।

হেনরি চেঁচিয়ে ডাকল,—বিল্, বিল্, কী হোলো?

হোলো? ব্যাঙটাও পালিয়েছে।

ব্যাঙ! পালিয়েছে? পাগল নাকি?

বলছি সে নেই।

কম্বলের মধ্যে থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে একলাফে কুকুরগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল হেনরি। কুকুরগুলোকে গুনে গুনে দেখল, তারপর এসে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে। তুষারমেরুর ধূসর অন্ধকার কোন্ অলংঘ্য আকর্ষণে তাদের আর একটা কুকুরকে টেনে নিয়ে গেছে।

একটু পরে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো,—ব্যাঙ,—ব্যাঙটা ছিল দলের সবচেয়ে বাঘা কুকুর।

বিল্ যোগ দিলে,—আর সবচেয়ে চালাক,—মোটকার মতো নয়।

বিষণ্ণমনে তারা প্রাতরাশ খেল, তারপর বাকি চারটে কুকুরকে স্লেজের সামনে জুতল। সেদিনটাও গত দিনেরই পুনরাবৃত্তি। তুষার-জমাট পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে নির্বাক পরিশ্রমে এগিয়ে চলল

দুটি মানুষ। চারদিকের স্তব্ধতা কেঁপে কেঁপে উঠছে অদৃশ্য অনুসরণ-কারীদের ডাকে। বিকেল গড়াতে না গড়াতেই রাত্রি এল, ডাকও এগিয়ে এল কাছে, যেন এখনই ঘিরে ধরবে তাদের। কুকুরগুলো ভয়ে কাঁটা, চমকে চমকে উঠতে লাগল তারা, তাদের গতি ব্যাহত হতে লাগল ;—সঙ্গের দুজন মানুষের মন আরো মুষড়ে পড়ল।

সেরাত্রে কুকুরগুলোর সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বিল্ বললে,—বোকা হারামজাদারা, এবার তোরা জব্দ !

হেনরি রান্না ছেড়ে এগিয়ে এসে দেখল, বিল্ কুকুরগুলোকে একেবারে রেড ইণ্ডিয়ানদের কায়দায় বেঁধে ফেলেছে। প্রত্যেকটা কুকুরের গলায় মোটা চামড়ার বেল্ট বাঁধা। ঠিক গলার কাছে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা একটা করে মোটা দু-তিন হাত লম্বা লাঠি। সেই লাঠির একটা দিক আবার চামড়া দিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে আটকানো। কোনো কুকুর দাঁত দিয়ে চামড়ার বেল্ট কাটতে পারবে না। তার দাঁত পৌঁছবে কাঠের লাঠিতে। লাঠিটার ওপারের চামড়ার বেল্টটা কামড়াবারও তার উপায় নেই।

হেনরি মাথা নাড়ল, খাসা হয়েছে। বললে,—এক-কানটাকে আটকে রাখার এই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায়। ওর দাঁতে যা ধার, এক কামড়ে ছুরির ফলার মতো চামড়ার বেল্ট দুখানা করে দিতে পারে। কাল সকালে দেখব সব কটা ঠিক আছে।

বিল্ বললে,—এর পরও কাল উঠে যদি দেখি কোনোটা সরেছে তাহলে কফি খাওয়া ছেড়ে দেব।

শোবার সময় হেনরি চারপাশের আগুন-চোখের গণ্ডী লক্ষ্য করে বললে,—ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে আমাদের হাতে ওদের মরণ নেই। কয়েকটা গুলি যদি চালাতে পারতাম, তাহলে এতটা সাহস ওদের ভাঙত। রোজ রাত্রে দেখছি সাহস বাড়ছে, এগিয়েই আসছে।

বিল, ঐ-টেকে দেখছ? আগুন থেকে চোখটা সরাও! দেখছ ঐ ব্যাটার চোখ দুটো?

অগ্নিকুণ্ডের ওপারে অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে এক এক জোড়া চোখের পিছনে ফুটে ওঠে মিশকালো এক একটা প্রেতচ্ছায়া। জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখের পেছনে স্থির জান্তব রেখা ধরা পড়ে। মাঝে মাঝে রেখাগুলো নড়ে চড়ে। দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে ওদের দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙল কুকুরদের চিৎকারে।

এক-কান ডাকছে, প্রাণপণে ছাড়ছে এক একটা ডাক আবার শব্দ করছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সেই সঙ্গে ছুটে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে অন্ধকারে, বাঁধন ছিঁড়তে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে পাগলের মতো গলায় বাঁধা লাঠিটাকে কামড়াচ্ছে।

ফিস ফিস করে হেনরি বললে,—বিল্, ছাখো কাণ্ড!

চোরের মতো চুপিসারে পাশ কাটিয়ে এগোতে এগোতে জ্বলন্ত কাঠের ঠিক আলোর সামনে এসে পৌঁছলো কুকুরের মতো একটা প্রাণী। তার নড়ন চড়নে ফুটে উঠেছে যেমনি সন্দেহ তেমনি দুঃসাহসের ভাব। কুকুরগুলোর দিকে তার উদ্গ্রীব দৃষ্টি, আবার মানুষদের দিকে তার সাবধানী নজর। বেল্ট আর লাঠির বাঁধনকে টান টান করে ওটার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এক-কান, ওটার কাছে যাবার আগ্রহে কাৎরে কাৎরে উঠছে।

চুপি চুপি বিল্ বললে,—বোকা এক-কানটা ভয় পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না?

হেনরি তেমনি খাটো গলায় উত্তর দিলে,—মাদী নেকড়ে। ওটাই মোটকা আর ব্যাঙকে টেনে নিয়ে গেছে। ওটাই দলের হয়ে দূতিয়ালি করে। এক একটা মদ্দা কুকুরকে লোভ দেখিয়ে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়, তারপর সবাই মিলে ছিঁড়ে খায়।

ফট করে পোড়া কাঠের শব্দ হোলো। অগ্নিকুণ্ডের ওপরের একটা মোটা গুঁড়ি হুড়মুড় আওয়াজে নিচে গড়িয়ে পড়ল। কিম্ভূত জন্তুটা এক লাফে পিছিয়ে গা ঢাকা দিল অন্ধকারে।

হেনরি, আমার ঠিক মনে পড়েছে।

কী মনে পড়ল?

এইটেকেই আমি লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিলাম।

আমারও তাতে কোনো সন্দেহ নেই,—হেনরি উত্তরে বললে।

আর একটা কথা। তাঁবুর আগুনে ভয় পায় না, ব্যাপারটা ভারি সন্দেহজনক।

ঠিকই তো, হেনরি ঠাট্টা করে বললে,—তাছাড়া ভাখো, মাদী নেকড়ে হয়ে কুকুরদের দলে ভেড়ে, কুকুরদের খাবার সময় এসে হাজির হয়,—ওটার স্বভাব চরিত্র মোটেও ভালো নয়, তাই না?

বিল্ ভাবতে ভাবতে বললে,—আমাদের বুড়ো ভিলানের একটা কুকুর নেকড়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, বুঝলে? তারপর হরিণ-চরার মাঠে এক ঝাঁক নেকড়ের মাঝখানে ঠিক ওটাকেই আমি একদিন শিকার করে ফেলেছিলাম। ওটাকে দেখে বুড়ো ভিলানের সে কী কান্না! বলে, তিন বছর পরে মরা কুকুর ফিরে পেল। এতদিন নাকি নেকড়েদের সঙ্গেই ছিল।

ঠিক ধরেছি বিল্, হেনরি চমকে বলে উঠল,—ওটা নেকড়ে নয়, কুকুর। মানুষের হাত থেকে মাছ খাওয়া ওর পুরোনো অভ্যাস।

হুঁ, বিল্ বললে,—ছিল নেকড়ে, তোমার কথায় হোলো কুকুর,—একবার আমি সুযোগ পাই তো স্রেফ মাংসের দলা বানিয়ে ছাড়ব। রোজ রোজ আমাদের একটা কুকুর যাচ্ছে ওটার পেটে।

হেনরি আপত্তি করল,—তিনটে মাত্র কার্তুজ, খেয়াল আছে?

বিল্ উত্তর দিলে,—এমন তাকে থাকব, প্রথম গুলিটা ফস্কাবে না। দেখো তুমি।

সকালবেলা উঠে হেনরি আগুনটা বাড়াল, রান্না করল প্রাতরাশ। বিল্ তখনো নাক ডাকাচ্ছে। খাবার সাজিয়ে হেনরি তাকে টেনে তুলল, বললে,—বড় আরামে ঘুমুচ্ছিলে ভায়া—ডাকতে মন সরছিল না।

আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় বিল্ খেতে আরম্ভ করল। পেয়ালা খালি দেখে সে কফির কেটলিটার দিকে হাত বাড়াল। কেটলিটা কিন্তু হেনরির ঠিক পাশে, তার হাতের নাগালের বাইরে।

হাতটা টেনে এনে বিল্ বললে,—ও হেনরি, একটা জিনিষ দিতে ভুলে গেছ যে!

হেনরি চারদিকে বেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখল, তারপর মাথা নাড়ল। বিল্ খালি পেয়ালাটা তুলে ধরে বললে,—আমার কফি কই?

কফি? হেনরি গম্ভীর গলায় বললে,—কফি তুমি পাবে না।

বিল্ বললে,—কেন, ফুরিয়ে গেছে নাকি?

না।

তবে? ভাবছ সকালবেলার বরাদ্দ কফিটায় আমার হজমের গোলমাল হবে?

না।

দপ্ করে চটে উঠল বিল্, হাঁকলে,—তাহলে দয়া করে বলো না ব্যাপারটা কী? কেন কফি দেবেনা আমাকে! কৃতার্থ করো খুলে বলে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে হেনরি ঘোষণা করলে,—স্প্যাংকার পালিয়েছে।

শয়তানের কল! কী দুর্ভাগ্য! বিল মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, সেইখানে বসে বসে বাকি কুকুর তিনটেকে গুনল। তারপর নিতান্ত নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করল,—কেমন করে হোলো?

কাঁধ ঝাঁকুনি দিল হেনরি,—কে জানে? নিশ্চয়ই এক-কান ওর বেল্টটা চিবিয়ে ছিঁড়েছিল। নিজের বাঁধন নিজে খোলবার সাধ্য তো ছিল না!

আপদ! ধীর গম্ভীর গলায় গালাগাল দিল বিল্। মনের মধ্যেকার আগুনে রাগ গলায় চেপে রেখে সে বললে,—নিজের বাঁধন চিবিয়ে খুলতে না পেরে ব্যাটা স্প্যাংকারকে খুলে দিয়েছে।

হেনরি বললে,—যাক, স্প্যাংকারের ভবযন্ত্রণা শেষ হয়েছে। সে এতক্ষণে বিশটা নেকড়ের পেটে টুকরো টুকরো হয়ে হজম হয়ে গেছে। তুমি কফি একটু খাও।

বিল্ মাথা নাড়ল।

আরে খাও,—হেনরি পাত্রটা তুলে ধরল।

খাব না, খাব না, খাব না। আমি বলেছিলাম এবার একটা কুকুর যদি পালায় কফি খাওয়া আমার বন্ধ। কথার নড়চড় নেই।

হেনরি লোভ দেখিয়ে বললে,—ভায়া, সকালের কফিটা হয়েছে কিন্তু চমৎকার।

বিল্ কিন্তু ভাঙল না। সে শুকনো প্রাতরাশ চিবিয়ে বিড় বিড় করে এক-কানকে গাল দিতে লাগল।

যাত্রা সুরু করার সময়ে সে বললে,—আজ রাত্রে ব্যাটাদের এমন করে বাঁধব, একটা যেন আর একটাকে ছুঁতে না পারে।

মাত্র একশো গজ এগিয়েছে এমন সময় হেনরির জুতোয় কিসের হোঁচট লাগল। অন্ধকারে চোখে না দেখলেও হাতে ছুঁয়েই হেনরি বুঝল জিনিষটা কী। সে সেটাকে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল। স্লেজের ওপর পড়ে লাফিয়ে উঠে পিছনে বিলের পায়ের কাছে সেটা পড়ল হেনরি চেঁচিয়ে বললে,—ওটা তোমার কাজে লাগবে হে!

বিল্ চমকে উঠল। ওটা স্প্যাংকারের অবশেষ,—সেই লাঠিটা। বিল্ চেঁচিয়ে বললে,—হাড় চামড়া সবশুদ্ধ কুকুরটাকে গিলে খেয়েছে! লাঠিটা একেবারে বাঁশির মতো চকচকে। দুধারের চামড়ার টুকরোগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে, দেখেছ! বুঝলে হেনরি, ওদের খিদের শেষ নেই, ওদের শেষ লক্ষ্য আমরা।

হো হো করে হেনরি হেসে উঠল, বললে,—নেকড়ের হাতে অবশ্য জন্মে পড়িনি, তবে এর চেয়ে অনেক বিপদের মুখে পড়েও এখনো বেঁচে আছি। আরে বাবা, আমাকে মারা অতো সহজ নয়, ঐ-কটা মড়াখেকো জানোয়ারের পেটে যেতে আমি আসিনি!

বিল্ বিড় বিড় করতে লাগল, খোদা জানে, খোদা জানে।

তা তুমিও জানবে, হেনরি হেঁকে বললে,—একবার ম্যাক্‌গারীতে পৌঁছোই!

বিল্ তবু বললে,—আমার কিন্তু ভাই মোটেই ভালো লাগছে না।

হেনরি বললে,—আসল কথা কী জানো, তোমার ভবিয়তটা ঠিক নেই। একবার ম্যাক্‌গারীতে পোঁছোই, তারপর কড়া ডোজে কুইনীন ঠুসে দেবো তোমাকে।

হেনরির ডাক্তারিতে বিল্ খুসি হোলো না। মুখ বুজে গুম্ হয়ে চলতে লাগল। এ দিনটাও আগেরই মতো নূতনত্বহীন। নটা নাগাদ আলো ফুটল, বারোটা নাগাদ অদৃশ্য সূর্যের আভায় দক্ষিণ চক্রবাল উজ্জ্বল হোলো। তারপরেই স্বরু হোলো পড়ন্ত বিকালের ধূসরতা; তিন ঘণ্টা পরে রাত্রি।

সূর্য যখন প্রকাশ হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, সেই সময়ে বিল্ শ্লেজের ধার থেকে চামড়ার বাঁধন খুলে বন্দুকটা বার করে নিল, বললে,—হেনরি, তুমি সোজা এগোও, আমি একটু এদিক-ওদিক দেখি।

সঙ্গী আপত্তি করল, উঁহুঃ, উঁহুঃ, স্লেজের কাছাকাছি থাক। হাতে তো মাত্র তিনটে গুলি, অতো বীরত্বে কাজ নেই।

বিল্ সোৎসাহে বললে,—এবার ঘাবড়াচ্ছে কে?

হেনরি কথা বাড়াল না। একলা সে এগোতে লাগল আর মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিছন দিকে তাকাতে লাগল, যেখানে ধূসর সীমানার ওপারে তার সঙ্গী অদৃশ্য হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরে বিল্ ফিরে এল।

বললে,—নেকড়েগুলো দু' পাশে অনেক দূরে দূরে সরে আছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, আবার এদিক ওদিক অন্য শিকারও খুঁজছে। জানো হেনরি, ওরা নিশ্চয় আমাদের খাবে, তবে আরো কিছুদিন ওদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে হাতের কাছে আর যা কিছু পাচ্ছে তাতেই পেট ভরাচ্ছে।

হেনরি গম্ভীর স্পষ্ট গলায় বললে, ওরা আমাদের খাবেই? নিশ্চয়টা কে? তুমি না ওরা?

বিল এড়িয়ে গেল এ কথা। বলতে লাগল,—ওদের কটাকে আমি দেখলাম। রোগা জিরজিরে চেহারা। হাড় পাঁজরা বার করা পিঠের শিরদাঁড়ায় পেট গিয়ে ঠেকেছে। হপ্তার পর হপ্তা অনেকের পেটে কিছুই পড়েনি। তিনটে কুকুর কটারই বা একদিনের পেট ভরিয়েছে! খিদেয় ওরা মরীয়া হয়েছে, এবার পাগল হোলো বলে। তারপর সাবধান!

এবার ওরা চলতে লাগল, বিল্ আগে, পিছনে হেনরি। কয়েক মিনিট পরে হেনরি সাবধানসূচক মৃদু শিষ দিল। বিল পিছন ফিরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কুকুরগুলোকে থামাল। পিছনে এইমাত্র যে একটা বাঁক তারা পার হয়ে এসেছে সেটার মোড়ে তাদেরই ফেলে আসা পথচিহ্নের ওপর দিয়ে তাদের অনুসরণে দৌড়ে আসছে একটা

গুঁড়িসুড়ি লোমশ দেহ। বরফের ওপরকার পথচিহ্নের ওপরে ওর নাক;—স্বচ্ছন্দ গড্ডলিকার মতো কেমন অদ্ভুত ওর অনায়াস গতি। তারা যেই দাঁড়াল ওটাও থামল সঙ্গে সঙ্গে। মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে ওদের নিরীক্ষণ করতে লাগল, কম্পিত নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টেনে পরিচয় নিতে লাগল তাদের গন্ধের।

বিল চুপি চুপি বললে, এই সেই মাদী নেকড়েটা!

কুকুরগুলো বরফের ওপর এলিয়ে পড়েছে, বিল শ্লেজটা পার হয়ে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াল।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা সেই বিচিত্র জানোয়ারটাকে দেখতে লাগল, যেটা দিনের পর দিন তাদের পায়ে পায়ে অনুসরণ করে চলেছে, যেটা ইতিমধ্যে তাদের কুকুরের দলের অর্ধেক সাবাড় করে দিয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের খানিকক্ষণ দেখার পর জন্তুটা কয়েকটা পা এগোল। আবার দাঁড়াল, আবার এগোল। ক্রমে ক্রমে প্রায় একশো গজের মধ্যে এসে গেল। তারপর একগুচ্ছ ঝাউ-এর পাশে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে দৃষ্টি আর ঘ্রাণ দিয়ে মানুষগুলোকে দূর থেকে যেন লেহন করতে লাগল। ওর চোখে কেমন যেন একটা করুণ চাউনি, ঠিক কুকুর যেমন করে তাকায় তেমনি। কিন্তু কুকুর মানুষকে যেমন ভালবাসে, তার কোনো ইশারা নেই সে দৃষ্টিতে। এ কারুণ্যের জন্ম ক্ষুধা থেকে;—যে চোখ ছল ছল করছে তার পিছনে আছে হিংস্র দাঁতের নিষ্ঠুরতা, শীতের কুয়াসার মতো ঠাণ্ডা নিষ্করুণ।

নেকড়ের চেয়ে অনেক বড়ো দেখতে,—বিরাটকায় উৎকট চেহারা। হেনরি বললে, মাটি থেকে কাঁধটা প্রায় আড়াই ফুট উঁচু, আর লম্বায় তো পাঁচ ফুট হবেই। কি বল?

বিল বললে,—আর, কি আশ্চর্য গায়ের রঙটা দেখেছ? দারুচিনির ছালের মতো ঠিক। এমনি লাল নেকড়ে কক্ষনো আমি দেখিনি!

দারুচিনির রঙটা অবশ্য ঠিক নয়। ওর গায়ের চামড়া ঠিক নেকড়েরই মতো। নেকড়েরই মতো পাঁশুটে রঙের প্রাধান্য। কিন্তু তার মাঝে মাঝে কেমন একটা লালচে রঙ খেলা করছে। ময়ূরকণ্ঠী রঙ যেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়, তেমনি পাঁশুটে রঙের মাঝখানে হঠাৎ লাল রঙ এসে দাঁড়াচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। পাঁশুটের ওপর এমনি লাল রঙের লীলা সাধারণ অভিজ্ঞতায় মেলে না।

বিল বলল, বিরাট কুঁদো একটা শ্লেজটানা কুকুর যেন, তাই না? এখন যদি ল্যাজ নাড়তে সুরু করে তাতেও আশ্চর্য হব না।

আঃ আঃ, আয়, এদিকে আয়রে তুই, বিল চেঁচিয়ে ওটাকে ডাকতে লাগল।

হেনরি হেসে উঠল, একটুও ভয় পাচ্ছে না তোমাকে।

বিল শাসনের ভঙ্গিতে হাত নাড়তে লাগল, ধমক দিতে লাগল চিৎকার করে। জন্তুটার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই, চেহারায় কেবল একটু সাবধানতার আভাস ধরা পড়ল। সমানে মানুষদের দিকে ও তাকিয়ে রইল নিষ্করুণ ক্ষুধার্ত ছলছল চোখে। ক্ষিদেয় ও জ্বলছে আর অদূরে সামনে রয়েছে মাংস, ক্ষুধা নিবারণের অপূর্ব ভোজ্য। অতোটা সাহস নেই, কিন্তু প্রাণ চাইছে মুখ বাড়িয়ে কামড়ে দিতে, পেটে পুরতে।

বিল্ কী ভাবছিল, গলা নামিয়ে আস্তে বললে, হেনরি, তিনটে গুলি আছে, কিন্তু অব্যর্থ লক্ষ্য সামনে। আমার হাত এবার কিছুতে ফস্কাবে না। তিনটে কুকুর ও সাবড়েছে, আমি ওকে ছাড়ছিনে। লাগাই?

হেনরি মাথা নাড়ল। বিল্ আস্তে আস্তে স্লেজের গা থেকে বন্দুকটা খসিয়ে নিল। বন্দুকটা কাঁধে তুলতে হোলো না, তার আগেই মাদী নেকড়েটা ঝাউগাছের পেছন দিকে একটা লাফ মেরে উধাও।

বিল আর হেনরি এ ওর মুখের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকাল। অবাক হয়ে শিস দিয়ে উঠল দ্বিতীয়জন।

বন্দুকটা রাখতে রাখতে মনের দুঃখে বিল্ বললে, আমারই বোঝা উচিত ছিল, যে-নেকড়ে ঠিক খাওয়ার সময় কুকুরের ঝাঁকে ঢোকে, বন্দুকও সে চেনে। আমি বলছি হেনরি, ওই মাদীটাই আমাদের যতো কষ্টের মূল। ওটার জন্যেই আমাদের ছটা কুকুর এখন তিনটেতে এসে ঠেকেছে। এও তোমাকে বলে দিলাম, ওটাকে আমি মারবই। সামনাসামনি না পাই, ওৎ পেতে ওটাকে মারব। ওটাকে যদি খতম করতে না পারি তো আমার নাম বিল্ নয়।

হেনরি সাবধান করল, তাই বলে রাগের মাথায় বেশি দূরে যেন যেয়ো না ভাই, নেকড়ের পাল যদি একবার তোমাকে পাল্লার মধ্যে পায়, তখন তিনটে কার্তুজ তো তিনটে নুড়ি। ক্ষিদেয় ওরা পাগল, পেলে কাউকে ছাড়বে না!

সেদিন রাত্রে খুব সকাল সকাল তারা তাঁবু গাড়ল। তিনটি মাত্র কুকুর, ছটি কুকুরের ভার টেনে তারা ক্লান্ত। শোবার আগে বিল্ কুকুরগুলোকে ফাঁক ফাঁক করে সরিয়ে সরিয়ে বাঁধল।

নেকড়েগুলোর সাহস বেড়েছে। রাত্রে বার বার ওরা ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতটা এগিয়ে আসে, যে কুকুরগুলো আতংকে আর্তনাদ করে ওঠে, বারে বারে জেগে উঠে আগুনে কাঠ গুঁজে দিতে হয়।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে একবার বিল্ বললে, আমার মনে

হচ্ছে, ঠিক যেন ওরা ডাঙার হাঙর। ওরা আমাদের চেয়েও চালাক। ওরা জানে ওদের গ্রাস তৈরি হচ্ছে।

হেনরি বললে, কী বকবক করছ!

দেখো, তুমি দেখো। আমাদের খাবেই, শেষ পর্যন্ত ঠিক ওরা আমাদের খাবে।

অর্ধেক তো খেয়েই ফেলেছে তোমাকে, রূঢ়স্বরে হেনরি ধমক দিল, তোমার মতো যে ভয় পায় সে তো অর্ধেক মরারই সামিল।

কঠোর হাসল বিল্, বললে, তোমার আমার চাইতে অনেক ভালো লোক আজ পর্যন্ত ওদের পেটে গেছে।

থামো থামো, বকবক করে পাগল করবে আমাকে!

রাগে গর গর করতে করতে হেনরি আবার পাশ ফিরে শুল। যে লোকটা একটুতেই গরম হয়ে ওঠে, সেই বিল্ কিন্তু চটল না। কথাও বলল না একটা। চোখের পাতা জুড়ে আসার আগে হেনরি ভাবতে লাগল, আশ্চর্য, সত্যি বিল্টা বড্ড ঘাবড়েছে, কাল সকালে ওকে একটু চাঙা করে তুলতে হবে।

ক্ষুধার আর্তনাদ

দিনটা আরম্ভ হোলো ভালোই। গত রাত্রে আর কোনো কুকুর খোয়া যায়নি। খুসি মনে দুই বন্ধু সুরু করল প্রভাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে তাদের হিম যাত্রা। দুর্ঘটনা ঘটল দ্বিপ্রহরে। একদিকে একটা গাছের গুড়ি আর অন্য দিকে মস্ত একটা পাথর, এই দুইএর মাঝখানে ধাক্কা খেয়ে শ্লেজটা উলটে গেল। কুকুরগুলোর বাঁধন খুলে দিয়ে নিচু হয়ে দু' বন্ধু শ্লেজটা সোজা করবার জন্যে হাত লাগাল।

হঠাৎ মুখ তুলে হেনরি দেখে, এক-কান আস্তে আস্তে সরে পড়বার চেষ্টা করছে।

এই, এই এক-কান! হেনরি চেঁচাতে চেঁচাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যেই এক-কান বরফের ওপর দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। কিছুটা দূরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সেই মাদী নেকড়েটা। নেকড়েটার কাছাকাছি গিয়েই এক-কান সাবধান হয়ে গেল। চট করে থামল, তারপর এগোতে লাগল এক পা এক পা করে।

মাদীটার সামনে এসে এক-কান নাক তুলে সেটার নাক শুঁকতে গেল। নেকড়েটা অমনি খেলাচ্ছলে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এক-কান যতো এগোয়, ততোই পেছিয়ে যায় ছলনাময়ী। এক পা এক পা করে সে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে। ক্ষণিকের জন্যে বোধহয় সম্বিত ফিরে এল এক-কানের, বারেকের জন্যে সে ওল্টোনো শ্লেজটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, যেখানে দাঁড়িয়ে তার এতদিনের মানুষ-প্রভুরা তাকে ডাকছে।

বিলের তক্ষুনি মনে পড়েছে বন্দুকের কথা। কিন্তু সেটা চাপা পড়ে আছে শ্লেজের তলায়। হেনরির সঙ্গে শ্লেজটাকে সোজা করে বন্দুকটা

বার করে নিতে যতোটা সময় লাগল তারমধ্যে এক-কান মাদী নেকড়ের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছে, আর প্রায় বন্দুকের পাল্লার বাইরে চলে গেছে।

এক-কান ভুল বুঝল দেরি করে। হঠাৎ সে দৌড়ে ফিরবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটকাবার জন্যে বরফের ওপর দৌড়ে এল প্রায় বারো চৌদ্দটা শীর্ণ ক্ষুধার্ত নেকড়ে। মুহূর্তে মাদী নেকড়েরও চেহারা বদলাল। ঘুচে গেল তার ছলনার খেলা,—বিকট মুখ ব্যাদান করে বীভৎস গর্জন করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-কানের ওপর।

বিলের হাত চেপে ধরে হেনরি চেঁচাল, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

পারব না, পারব না! হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল বিল্, আবার একটা কুকুর ওরা খাবে, আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারব না!

বন্দুক হাতে নিয়ে বিল্ স্লেজের পথ ছেড়ে সামনে ছুটল।

সাবধান সাবধান, থামো বিল্! যেয়ো না!

মধ্যদিনের কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেল বিল্।

স্লেজটার ওপর ধপ করে বসে পড়ল হেনরি। তার কিছু করার নেই। বিল্ চোখের আড়ালে, অদূরে ঝাউ শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এক-কানের চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হেনরি বুঝতে পারল, ওর রক্ষা নেই। স্লেজটাকে মধ্যে রেখে তার কাছে আসবার চেষ্টায় কুকুরটা বৃত্তাকারে ঘুরছে, নেকড়েগুলোও ঘুরছে তেমনি বৃত্তাকারে স্লেজ আর ওর মাঝখানের পথ আটকে। তাদের হাত ছাড়িয়ে এক-কান যে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে স্লেজের কাছে আসতে পারবে, সে আশা বৃথা।

কোথায় অদূরে কুয়াসার মধ্যে তার চোখের আড়ালে এক-কান আর বিল্ আর নেকড়ের পাল মুখোমুখি হোলো বলে, হেনরি ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে এল বন্দুকের গুলির আওয়াজ। একবার, একটু পরেই পর পর দুবার। চমকে উঠল হেনরি। আর গুলি নেই বিলের কাছে। তারপরেই কুয়াশার অদৃশ্য আস্তরণ ভেদ করে ভেসে এল গর্জন, আর আর্ত

চিৎকার। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই গর্জন আর ক্রন্দন দুইই থামল। চারদিক ঘিরে এল পুরোনো নিথর নিস্তব্ধতা।

স্লেজের ওপর একলা বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেল হেনরির। উঠে এগিয়ে গিয়ে কী হয়েছে দেখবার তার আর দরকার নেই। কল্পনায় স্পষ্ট ভেসে উঠেছে সেই অদেখা দৃশ্য।

শেষ পর্যন্ত যখন সে উঠে দাঁড়াল, সব শক্তি যেন তার শরীর থেকে লোপ পেয়েছে, ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ অবশ।

বাকি কুকুর দুটোকে সে স্লেজের সঙ্গে বাঁধল, একটা দড়ির ফাঁস জড়িয়ে নিল নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর কুকুরদের সঙ্গে স্লেজটা টেনে টেনে পায়ে পায়ে চলল। বেশী যাবার সাহস সেদিন হোলো না। অন্ধকার হতে না হতেই সে তাঁবু ফেলল, সংগ্রহ করল প্রচুর জ্বালানি কাঠ। তাড়াতাড়ি কুকুর দুটোকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, আগুনের গা ঘেঁসে বিছানা পাতল।

বিশ্রাম কিন্তু হেনরির ভাগ্যে আর নেই। চোখ বোজবার আগেই নেকড়ের দল চোখের সামনে এসে জুটেছে। ঠিক আগুনের ওপারে গোল হয়ে তারা জমায়েত হয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কেউ শুয়ে কেউ বসে, কেউ বা গুঁড়ি মেরে,—এগোচ্ছে পেছোচ্ছে, নড়ছে-চড়ছে। কোনোটা আবার ঘুমুচ্ছে বরফের ওপর ঠিক কুকুরেরই মতো পা গুটিয়ে—তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে।

নেকড়েদের এই ব্যূহ ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। অতি সন্তর্পণে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বুকে হেঁটে একবার এটা একবার ওটা সামনে এগিয়ে আসছে। আর বুঝি একটা লাফের ওয়াস্তা! হেনরি লাফিয়ে ওঠে, অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের দিকে। তাড়াতাড়ি পিছু হটে নেকড়েগুলো, ক্রুদ্ধ আওয়াজ করে হিংস্র জানোয়ারের দল, যেটার গায়ে আঘাত লাগে সেটা করে করুণ বীভৎস চিৎকার।

সকাল হোলো। বিনিদ্র রাত্রিশেষে হেনরির ক্লিন্ন পাণ্ডুর মুখ। অন্ধকারে সে প্রাতরাশ বানিয়ে খেল। নটার সময় আলো ফুটতে নেকড়ের দল পিছু হটল। তখন হেনরি সুরু করল সেই কাজ, গত রাত্রে যা ভেবে রেখেছে। গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে আড়াআড়িভাবে বেঁধে সে একটা মাচা বানাল, সেই মাচাটাকে সে বাঁধল একটা বড়ো গাছের গুড়ির অনেকটা ওপর দিকে। তারপর স্লেজের দড়ি দিয়ে কফিনটাকে বেঁধে টেনে টেনে সেটাকে সেই উঁচু মাচার ওপর তুলল। গাছের ওপরে খাটানো মাচায় তোলা মৃতদেহটাকে উদ্দেশ্য করে সে বিড় বিড় করে বলল, ওরা বিল্‌কে খেয়েছে, হয়তো আমাকেও খাবে : তবে তোমাকে ওদের নাগালের বাইরে তুলে দিলাম।

আবার সে চলল। হাল্কা স্লেজটা খুব তাড়াতাড়ি টানতে লাগল কুকুরদুটো। ওরাও যেন বুঝেছে, কোনো রকমে ফোর্ট ম্যাকগারি না পৌছলে নিস্তার নেই। নেকড়েগুলোর সাহসের অন্ত নেই। আর গা ঢাকা দিয়ে নেই তারা। নির্ভয়ে তারা ছুটে চলেছে স্লেজের পিছনে পিছনে বা পাশাপাশি ; ছুটতে ছুটতে টকটকে লাল জিভ বের করে তারা হাঁপাচ্ছে, শরীরের প্রতিটি আন্দোলনে ফুটে উঠছে তাদের শীর্ণ দেহের প্রতিটি হাড় পাঁজরা। জন্তুগুলো এত রোগা, যেন শুকনো হাড়ের ওপর চামড়ার খোলস ; গায়ের পেশীগুলো দড়ি পাকানো। হেনরির আশ্চর্য লাগল,—এত রোগা, এত দুর্বল, তবু ক্লান্ত হয়ে ঘুরে পড়ছে না বরফের ওপর, ছুটে চলেছে সমানে।

অন্ধকার পর্যন্ত চলতে হেনরির সাহস হোলো না। সেদিন দ্বিপ্রহরে সূর্য শুধু যে দক্ষিণ দিগন্তকে উদ্ভাসিত করল তাই নয়, চক্রবালের প্রান্তে দেখা গেল সোনালি পাণ্ডুর বলয়ের একাংশ। হেনরি বুঝল দিন বাড়ছে, তার চিহ্ন সূর্যের এই আত্মপ্রকাশ। কিন্তু

সূর্যালোক মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হেনরি যাত্রা থামিয়ে তাঁবু গাড়ল। তখনো ম্লান গোধূলির কয়েক ঘণ্টা দেরি, এ সময়টা সে যতোটা পারে জ্বালানি কাঠ কেটে নিল।

রাত্রি এল, এল বিভীষিকা। শুধু যে ক্ষুধার্ত শ্বাপদগুলোর সাহস বেড়েছে তা নয়, ঘুমের অভাবের কষ্ট ফুটে উঠেছে হেনরির দেহে মনে। খুব চেষ্টা সত্ত্বেও তন্দ্রাকে তাড়াতে পারছে না আর। আগুনের ধারে গুঁড়ি হয়ে বসে পিঠের ওপর কম্বল ফেলে দিল, হাঁটুর মাঝখানে কুঠার নিয়ে আর দুপাশে কুকুর দুটোকে জড়িয়ে সে ঢুলতে লাগল। একবার তন্দ্রা ভাঙতে তার চোখে পড়ল, মাত্র হাত বারো দূরে ঠিক তার সামনাসামনি বসে আছে বিরাট কুঁদো পাঁশুটে রঙের একটা নেকড়ে। ঠিক পোষা কুকুরের মতো বসে তার চোখের সামনে শয়তানটা পা ছড়িয়ে দিব্যি আয়েসে হাই তুলল, এমন করে পরম অধিকারের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল, যেন সে ওর খোরাক ছাড়া আর কিছু নয়, তা আজই থাক বা দুদিন পরে।

দুঃস্বপ্নভরা তন্দ্রালুতার মধ্যে আবার কখন চোখ খুলে হেনরি দেখল, মাত্র কয়েক ফুট অদূরে তার সামনে এবার বসে আছে সেই লালচে লোমশ মাদী নেকড়েটা।

হেনরির দুপাশের কুকুরদুটো ভয়ে চিৎকার করছে, মাদীটার ভ্রূক্ষেপ নেই। নেকড়েটার চোখে সোজা চোখ রেখে হেনরি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জন্তুটার চোখে কোনো উগ্রতা নেই, ক্ষুধার্ত লোলুপতায় মৃদু করুণ তার দৃষ্টি। ও তার খাদ্য, ওকে দেখে উৎসুক আনন্দে,আশার আশ্বাসে তার জিভ দিয়ে লালা ঝরে ঝরে পড়ছে।

আতংকের একটা তরঙ্গ যেন সহসা বয়ে গেল হেনরির চেতনায়। তাড়াতাড়ি সে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে দাঁড়াল নেকড়েটাকে

মারবার জন্যে। কাঠটা ধরামাত্র বিকট চিৎকার করে নেকড়েটা পিছু হটল, সেই মুহূর্তে সেটার মুখের সমস্ত কারুণ্য ঘুচে গিয়ে এমন হিংস্র দাঁতাল জিঘাংসা ফুটে উঠল যে কেঁপে উঠল হেনরি। জলন্ত কাঠ চেপে ধরা নিজের হাতটার দিকে হেনরি চেয়ে দেখতে লাগল। কী চমৎকার তার আঙুলগুলো, কী সুন্দর ক্ষমতায়, কী মনোহর বলিষ্ঠতায় কাঠটা চেপে ধরে আছে! সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনায় ভেসে উঠল,—মাদী নেকড়ের সেই সাদা সাদা দাঁতের পাটি কামড়াচ্ছে, মচকাচ্ছে, ছিঁড়ছে, ভাঙছে তার আঙুলগুলো। আজ চরমতম বিপদের মুখে তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে এত মায়া তার হোলো, এত ভালো তাদের সে বাসল, যা কখনো সে বাসেনি।

সমস্ত রাত ধরে জলন্ত কাঠের অস্ত্রে সে নেকড়ের পালের সঙ্গে লড়াই করল। মাঝে মাঝে ঘুম এলেই সঙ্গী কুকুর দুটো আর্তনাদ করে তাকে জাগিয়ে দিতে লাগল। বিভীষিকাময়ী রাত্রি কাটল, কিন্তু এই প্রথম দিনের আলোতেও নেকড়ের পাল পালাল না। একবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করল শত্রুব্যূহ ভেদ করে যাত্রা-পথে এগোতে। কিন্তু আগুনের আশ্রয় ছেড়ে এক পা যেই সে এগিয়েছে, অমনি অসমসাহসী একটা নেকড়ে লাফ মারল তার দিকে। লাফিয়ে পিছু হটে অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেল, নেকড়েটা সরলো তার উরুর কয়েক ইঞ্চি মাংস খসিয়ে নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পালের অন্য জানোয়ারগুলোও তাড়া করে এল তার দিকে; তাদের দূরে সরাবার জন্যে হেনরি এলোপাতাড়ি জলন্ত কাঠ ছুঁড়তে লাগল।

দিনের বেলায় হেনরির এমন কি এ সাহসও হোলো না, আগুনের আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে কিছুটা জ্বালানি কাঠ কেটে আনে। প্রায় বিশ হাত দূরে একটা মস্ত লম্বা শুকনো মরা ঝাউগাছ

ছিল। সারাদিনের অর্ধেক সময় ধরে সে আস্তে আস্তে তাঁবুটাকে ঐ গাছটার কাছে টেনে নিয়ে গেল আর হাতে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে সে তাড়াতে লাগল শত্রুদের। গাছটার কাছে পৌঁছে সে চারদিকের জঙ্গল ভালো করে লক্ষ্য করে এমন নিশানা করে গুড়িটা কাটতে লাগল, যাতে করে গাছটা অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি হেলে পড়ে।

এ রাত্রিটাও আগের রাত্রিরই মতো ভয়ংকর, আরো বেশি ভয়ংকর। সমস্ত শরীর ঘুমের আক্রমণে মুহ্যমান হয়ে আসছে। কুকুরত্নটোর ডাকের ক্ষমতাও লোপ পাচ্ছে। তাছাড়া ওরা ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে; হেনরির তন্দ্রালু, ক্লান্ত ইন্দ্রিয় ধরতে পারছে না কখন্ ওরা জোরে ডাকছে, কখন্ আস্তে। হঠাৎ একবার বন্ধ চোখ খুলে সে দেখল, মাদী নেকড়েটা এসে বসেছে ঠিক তার সামনে—এক গজও দূরে নেই। যান্ত্রিকভাবে হাত তুলে একটা গনগনে কাঠের ডাণ্ডা হেনরি ঢুকিয়ে দিল নেকড়েটার লাল টকটকে হাঁ'র মধ্যে। যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে নেকড়েটা এক লাফে পালাল, কয়েক ফুট দূরে গিয়ে তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়তে আর গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল; সেই দৃশ্যে, আর নেকড়েটার পোড়া মাংস আর লোমের গন্ধে হেনরির তন্দ্রালু চৈতন্য আত্মপ্রসাদে ভরে এল।

ঘুমের মধ্যে এল স্বপ্ন; পৌঁছে গেছে সে ফোর্ট ম্যাকগারিতে। উষ্ণ আরামের মধ্যে বসে সে তাস খেলছে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু কোথা থেকে এল নেকড়ের পাল, আক্রমণ করল কেল্লা। বন্ধ সিং-দরজার সামনে নেকড়ের পাল আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, চ্যাচাচ্ছে। ওদের গণ্ডগোল আর ব্যর্থ চেষ্টায় হেনরি আর বন্ধুরা খেলার মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। কিন্তু হঠাৎ একী হোলো! দরজা ভেঙে পড়ল, পালে পালে নৃশংস জানোয়ার দুর্গের সামনের হলঘরের

মধ্যে ঢুকল। খাড়া লাফিয়ে আক্রমণ করল তাদের। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গর্জনও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে, গর্জনে কান যেন ফেটে পড়ে!

হঠাৎ জেগে দেখল, গর্জন স্বপ্নের নয়; নেকড়ের গর্জন উঠছে তার চারদিক ঘিরে। ঘিরে ধরেছে তাকে নেকড়ের পাল। একটার দাঁত তার হাত কামড়ে ধরল। এক ঝটকায় হেনরি আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল, তার হাতের অনেকখানি কাঁচা মাংস রয়ে গেল নেকড়েটার জোয়ালের ফাঁকে। তখন সুরু হোলো আগুনের লড়াই। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে মোটা দস্তানা পরা হাতে হেনরি চারদিকে ছুঁড়তে লাগল জলন্ত কাঠ আর কাঠকয়লা; দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য পাগলের মতো তার অবস্থা, ক্যাম্পের অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন ঝরছে চারদিকে আগ্নেয়গিরির মতো। কিন্তু এমনি লড়াই কতক্ষণ আর সে লড়বে? তার সারা মুখে আগুনে ফোস্কা পড়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ভ্রূ আর চোখের পাতা, পায়ের তলা অসহ্য জ্বলতে লাগল। দুহাতে দুটো বড়ো বড়ো জলন্ত কাঠ নিয়ে সে অগ্নিকুণ্ডের বাইরে ছুটে এল। নেকড়েগুলো পিছিয়েছে। চারদিকে যেখানে যেখানে গরম কাঠ ও কয়লা পড়ছে, বরফের ওপর ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া উঠছে; সেই গরম কয়লার ওপর যখনি এক-একটা নেকড়ের পা পড়ছে, তখনি জানোয়ারটা তীব্র রুষ্ট আর্তনাদ করে উঠছে।

নিকটতম শত্রুর উদ্দেশ্যে পোড়া কাঠ দুটো ছুঁড়ে হেনরি নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়াল, হাতের পোড়া দস্তানাদুটো আগুনে ছুঁড়ে ফেলে ঠাণ্ডা বরফের ওপর পা জুড়োতে লাগল। কুকুর দুটোর পাত্তা নেই, মোটকা কুকুরটাকে দিয়ে যে ভোজ সুরু হয়েছিল, সেই ভোজেই তারাও শেষ পর্যন্ত লেগেছে।

অদূরের ক্ষুধার্ত জন্তুগুলোর দিকে হাত তুলে ঘুসি পাকিয়ে ভাঙা

গলায় সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল,—এখনো আমি বাকি, এখনো আমাকে তোরা পাসনি।

তার গলার আওয়াজে নেকড়ের দল চঞ্চল হয়ে উঠল, তারাও উত্তর দিল চাপা গর্জনে ;—আর সেই মাদী নেকড়েটা দু-পা এগিয়ে এসে তার দিকে করুণ চোখ মেলে তাকিয়ে জিভের জল চাটতে লাগল।

একটি নতুন উপায় এল হেনরির মাথায়। কাঠগুলোকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে অগ্নিকুণ্ডটাকে সে বড় করল ;—মাঝখানটা ফাঁকা রাখল। তারপর সেই অগ্নিবৃত্তের মাঝখানে সে গুঁড়ি মেরে ঢুকল। অগ্নিশিখার আশ্রয়ে এমনিভাবে সে আত্মগোপন করামাত্র নেকড়ের দল আগুনের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল চোখে তাকে খুঁজতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত ওরা আগুনের কাছাকাছি আসতে পারছিল না, এখন সবাই আগুনের পাশে পাশে বসে শুয়ে হাই তুলতে লাগল, আগুন পোহাতে লাগল পোষা কুকুরের মতো। মাদী নেকড়েটাও এসে বসল। সারা শরীরটা খাড়া করে আকাশের একটা তারার দিকে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে সে স্বরু করল চিৎকার। একটা একটা করে তার সঙ্গে চিৎকারে যোগ দিল অন্য নেকড়েরা ; একটু পরেই দেখা গেল, দলের সব কটা নেকড়ে একসঙ্গে অন্ধকার আকাশে মুখ তুলে ক্ষুধার আর্ত কান্না কাঁদছে।

ভোর হোলো, ফুটল দিনের আলো। অগ্নিশিখা নিবে এসেছে, ফুরিয়ে এসেছে জ্বালানি কাঠের সঞ্চয়। অথচ অগ্নিবৃত্তের বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।

আগুনের পড়ন্ত পাহারার মাঝখানে সারা গা কম্বলে ঢেকে উঁচু হয়ে বসে আছে একলা মানুষটা। তার শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, নুয়ে গেছে কাঁধদুটো। দুই হাঁটুর মাঝখানে লুকোনো মাথাটার ভঙ্গি যেন জানিয়ে দিচ্ছে, আর যুদ্ধ করার নেই। মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে দেখছে, আগুন নিভে আসছে। জ্বলন্ত বৃত্তের মাঝে

মাঝে ফাঁক দেখা যাচ্ছে; জ্বালানি কাঠ ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হচ্ছে ফাঁকগুলো।

অস্ফুট গলায় সে উচ্চারণ করল—এবার, এবার ওরা আসবে, ধরবে আমাকে। তা আসুক, আমি তো এখন ঘুমোবই!

একবার যেন ঘুম ভাঙল, দেখল, বৃত্তের একটা ফাঁকের মুখে তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে নিশ্চিত ভাগ্যের মতো সেই মাদী নেকড়েটা।

আবার তার ঘুম ভাঙল। কতক্ষণ পরে, মাঝে কতো সময় কেটে গেছে—কতো প্রহর, খেয়াল নেই। কী আশ্চর্য, যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে মনে হোলো,—এই চেতনার ধাক্কায় চমকে উঠে সে হঠাৎ স্পষ্ট চোখ মেলে বড়ো বড়ো করে তাকাল। কী যেন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে, যা তার ধারণায় আসছে না। দেখল সে,—নেকড়েরা নেই। বরফের ওপরে তাদের পায়ের ছাপ পরিচয় দিচ্ছে তার কতোটা কাছ পর্যন্ত ওরা এসেছিল। ঘুম তাকে কালো চাদরের মতো জড়িয়ে ধরল, মাথা আবার নুয়ে পড়ল; সেই মুহূর্তেই আবার একটা চমকের আঘাতে সে জাগল।

শব্দ আসছে কানে—এ কী অনির্বচনীয় মধুর স্বরতরঙ্গ! মানুষের গলার ধ্বনি, স্লেজের ঘড়ঘড় শব্দ, পোষা কুকুরের ডাক! নদীপথের ওপার থেকে ক্যাম্পের কাছে চারটে স্লেজ এসে পৌঁছেছে, মুমূর্ষু অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানের একলা মানুষটার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছজন লোক। তারা ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, ঘুম ভাঙাচ্ছে, ফিরিয়ে আনছে চেতনা। মাতালের মতো ঘোলাটে চোখে হেনরি তাদের দিকে তাকিয়ে ঘুমন্ত নিষ্প্রাণ গলায় বিড় বিড় করে বললে,—মাদী নেকড়ে, কুকুরের খাবার সময় আসত। প্রথমে কুকুরের খাবার খেল, তারপর খেল কুকুর। তারপর বিল গেল ওর পেটে। তারপর—

তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে একটা লোক তার কানের কাছে চিৎকার করে বললে,—লর্ড অ্যালফ্রেড কোথায়? লর্ড অ্যালফ্রেড?

আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল হেনরি,—না, তাকে খেতে পারেনি। ঐ আগের তাঁবুর জায়গায় একটা গাছের মাথায় ঝুলছে।

তিনি কি জীবিত নেই?

না, তা নেই। তবে বাক্সের মধ্যে।—হেনরি ধাক্কা দিয়ে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিল, বললে,—কেন বিরক্ত করছ? ভালো লাগছে না আমার। একটু ঘুমুতে দাও না ভাই!

তার চোখের পাতা একবার কেঁপে বন্ধ হয়ে গেল। বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল চিবুক। সকলে মিলে ধরাধরি করে যখন তাকে কম্বলের ওপর টান টান করে শোয়াল, নাক ডাকার নিরবচ্ছিন্ন শব্দ উঠছে ঠাণ্ডা বাতাসে।

অন্য এক শব্দও শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে ক্ষুৎপীড়িত নেকড়ের পালের চিৎকার। শেষ মানুষটাকে তারা ফস্কেছে, দুর্ভিক্ষের কান্না কাঁদতে কাঁদতে তারা আবার ছুটেছে অন্য মাংসের সন্ধানে।

আরণ্যক

নেকড়ের বাচ্চা

ভাইবোনদের থেকে বাচ্চাটা অন্য রকমের দেখতে। মা সেই মাদী নেকড়ে, বাপ হচ্ছে এক-চোখো। অন্য ভাইবোনগুলোর গায়ের লোম মায়েরই মতো লালচে; এ বাচ্চাটা কিন্তু বাপের রঙ পেয়েছে। বাচ্চার দলের মধ্যে এর রঙটাই একেবারে পাঁশুটে। এটা হয়েছে খাঁটি জাত-নেকড়ে, চেহারায় একেবারে বুড়ো এক-চোখো বাপের ধারা পেয়েছে। তফাৎ এইটুকু যে, বাপের চোখ একটা আর এর দুটো।

সবে সেদিন ওর চোখ ফুটেছে, কিন্তু এরই মধ্যে ওর চাউনিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। চোখ যখন ফোটেনি তার মধ্যেই ও শিখে নিয়েছে চাটতে, চাখতে, শুঁকতে, অনুভব করতে। ভাইবোনদের চিনে নিতেও দেরি হয়নি। তাদের সঙ্গে খেলতে মারামারি করতে শিখেছে, আর স্পর্শ দিয়ে স্বাদ দিয়ে আঘ্রাণ দিয়ে খুব ভালো করে চিনেছে মাকে,—মার কাছেই তো আছে মিষ্টি অমৃত, উষ্ণ মধুর আশ্রয়! জিভ দিয়ে নরম নরম করে মা তার নরম গা চেটে দেয়, ভারি আরাম লাগে; ঘন হয়ে মা-র গরম গা ঘেঁসে এসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ভারি ভালো লাগে।

জীবনের প্রথম মাসের সব সময়টাই তো এমনি ঘুমিয়েই কাটল। তবে এখন ও বেশ দেখতে পায়, অনেকক্ষণ জেগে থাকে, পৃথিবীকে একটু একটু করে চেনে। ওর পৃথিবীটা ধূসর অন্ধকার, কিন্তু ওর তাতে কিছু এসে যায় না, কেন না অন্য পৃথিবীর খোঁজ ও রাখে না। অন্য পৃথিবী যেখানে আলোকে আলোকময়, তার সঙ্গে ওর নতুন চোখের

পরিচয় হয়নি। আবছায়া অরণ্যগুহা ওর পৃথিবী, বাইরে সীমাহীন জগৎ। তবু সংকীর্ণতা ওকে কষ্ট দেয় না।

তবে প্রথম থেকেই ও বুঝেছে, ওর পৃথিবীর চারটে দেয়ালের একটা দেয়াল অন্য রকমের ; সেটা হচ্ছে গুহার মুখ, আলোর উৎস। এই অন্য রকমের দেয়ালের দিকে জন্ম থেকেই—চোখ খোলবার আগে থেকেই ওর কেমন একটা মগ্নচৈতন্যের আকর্ষণ। ঐখান দিয়ে আলো এসে ওর বন্ধ চোখের পাতায় আঘাত করেছে, ওর চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে আলোর রশ্মির উত্তপ্ত মধুর তীক্ষ্ন স্পর্শ। ওর ছোট্ট শরীরের ভিতরের প্রতি রক্তকণার সুগোপন প্রাণশক্তি ঐ আলোর দিকে উন্মুখ আগ্রহে বিকশিত হয়েছে, যেমন উদ্ভিদের অভ্যন্তরের কোন্ বিচিত্র রসায়নী শক্তি বরণ করে সূর্যকে।

ওর মন যখন অবচেতনার অন্ধকারে, তখন থেকেই ওর নবজাত শিশুদেহ গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে গুহার ঐ আলোকিত মুখের দিকে। এ অভ্যাস শুধু ওর নয়, ওর ভাইবোনদেরও। কেউই যেতে চায়নি কোনো অন্ধকার দেয়ালের দিকে ;—গুহামুখ সকলকেই টেনেছে। ওরা যেন উদ্ভিদ, আলো ওদের আকর্ষণ করে। আঙুর-লতার সূর্যমুখী লতানে ডালের মতো ওরা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়েছে ঐ যেখান থেকে আলো আসছে সেই দিকে। পরে বাচ্চাগুলো যখন আরো একটু বড়ো হোলো, নিজের নিজের বাসনা কামনার বোধ জন্মালো, তখন আকর্ষণ আরো বাড়ল। কেবলই তারা যেতে চায়,—গুঁড়ি মেরে, বুকে হেঁটে, গড়িয়ে—ঐ আলোর দিকে, আর ওদের মা ওদের টেনে আনে গুহার মধ্যে।

এমনি ভাবেই বাচ্চাটা ওর মা-র নতুন পরিচয় পেল। মা-র শুধু যে নরম কোমল জিভ আছে তাই নয়, মা-র একটা শক্ত নাক আছে যা দিয়ে সে ধাক্কার ধমক লাগায়, থাবাও আছে যার এক স্থির চকিত

আঘাতে ওকে আছড়ে ফেলে, মাটিতে ওকে লুটিয়ে ফেলে ঘুরপাক খাওয়ায়। ও শিখল ব্যথা পাওয়া কাকে বলে ; সঙ্গে সঙ্গে শিখল ব্যথা পাওয়া এড়ানোও যায় কেমন করে,—হয় ব্যথা পাওয়ার মতো কাজ না করে, না হয় তেমনি কাজ করার পর পিছিয়ে গিয়ে, লুকিয়ে পড়ে। ওর বোধ জন্মাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বুদ্ধি।

মেজাজটা তৈরি হচ্ছে ভীষণ হয়ে। যেমন ওর তেমনি ওর ভাই-বোনদের। হবেই তো,—মাংসাশী যে। যে জাত মাংস মারে আর মাংস খায় সেই জাতে যে ওর জন্ম। ওর বাপ মা মাংস ছাড়া আর কিছু কখনো খায়নি। জন্মের প্রথম ক্ষণ থেকে যে মাতৃস্তন্য ও খেয়েছে, সেই দুধও মাংস থেকেই তৈরি। এখন ওর বয়স মাত্র একমাস—এখনই ও মাংস খেতে সুরু করেছে—ওর মা মাংস খেয়ে অর্ধেক হজম করে আবার সেই মাংস মুখ থেকে বার করে পাঁচ বাচ্চাকে খাওয়ায়—বুকের দুধে ওদের আর তৃপ্তি নেই।

তবে ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে তেজী ও। অন্য সব বাচ্চার চেয়ে ও চেঁচায়ও বেশি, মেজাজও ওর সবচেয়ে গরম। থাবা মেরে একটা ভাই বা বোনকে উলটে ফেলার কৌশলটা সবার আগে ও-ই আয়ত্ত করেছে। আর-একজনের পাতলা কান দুই দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে টানাটানি করতে আর বন্ধ মুখে গোঁ গোঁ করতেও ও-ই শিখেছে সবার প্রথম। ওকে নিয়েই ওর মা-র যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি।

আলোর প্রতি আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে বাচ্চাটার। ও মতলব কেবলই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়বার, আর তার মা কেবলই ওকে ভেতরে টেনে আনে। গুহার মুখটা যে ঢোকবার পথ সেটা সে বোঝে না—সে বোঝে ওটাও একটা দেয়াল—তবে অন্য দেয়ালের মতো অন্ধকারের নয়,—আলোর দেয়াল। সূর্যকে ও দেখেনি, ঐ আলোর দেয়ালই ওর কাছে সূর্য। বাতি যেমন পোকাকে

আকর্ষণ করে, তেমনি আলোর দেয়াল ওকে টানে। ওর বাড়ন্ত বলে,—চলো, চলো ধরি গিয়ে ঐ আলোর দেয়াল। সত্যিই ওটা তো দেয়াল নয়, বাইরে যাবার পথ,—যে পথে জীবনের অমোঘ যাত্রা; ও কিন্তু এখনো অতশত জানে না।

এই আলোর দেয়াল নিয়ে একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য। এরই মধ্যে বাবাকে ও চিনতে শিখেছে, যে বাবা ওর মা-রই মতো বড়োসড়ো দেখতে, যে আলোর কাছে ঘুমোয় আর মাংস নিয়ে আসে। সেই বাবা সামনের আলোর দেয়াল পর্যন্ত সোজা গিয়ে তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা কেমন করে হয় পাগুটে বাচ্চাটা কিছুতে বুঝে উঠতে পারে না। এ দেয়ালটার কাছে মা ওকে যেতে দেয় না, কিন্তু কালো দেয়ালের কাছে এগিয়ে বারেবারে নরম নাকে কড়া ধাক্কা খেয়ে ওকে ফিরতে হয়েছে। ব্যথা লেগেছে; কয়েকবার চেষ্টা করে ও খেলা ও ছেড়েছে। কিন্তু আলোর দেয়ালে ঠেকে অদৃশ্য হয় কেমন করে ওর বাবা? ভারি আশ্চর্য তো? যেমন আশ্চর্য ওর মায়ের দুধ, আর নরম নরম মাংস।

অধিকাংশ বন্য প্রাণীদের মতো বাচ্চাটা অতি অল্প বয়সেই দুর্ভিক্ষের পরিচয় পেয়েছিল। মাংসের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, মায়ের স্তনের দুধও গেল শুকিয়ে। প্রথম প্রথম নেকড়ের বাচ্চাগুলো চেঁচাতো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, তবে অধিকাংশ সময়ই তাদের কাটত ঘুমিয়ে। ক্রমে ক্রমে খিদেয় তারা মৃতকল্প হয়ে পড়ল। দৌড়ঝাঁপ চিৎকার মারামারি সব ঘুচে গেল আস্তে আস্তে, সামনের আলোর দেয়ালের দিকে এগোবার উৎসাহ আর রইল না। তারা শুধু ঘুমুতে লাগল, ঘুমন্ত ক্ষুৎপীড়িত ছোট ছোট শরীর থেকে প্রাণশক্তি যেন ক্ষয়ে পড়তে লাগল।

এক-চোখোর তখন উন্মাদের মতো অবস্থা। চারদিকে যতোদূর ঘোরা সম্ভব সে দৌড়ে-দৌড়ে বেড়াতে লাগল আহারের সন্ধানে, ম্রিয়মান অন্ধকার গুহায় এসে শোবার সময়টুকুও সে পায় না। মাদী নেকড়েও

গুহা ছেড়ে মাংস খুঁজতে বার হোলো। বাচ্চাগুলো জন্মাবার পরে কদিন এক-চোখো রেড ইণ্ডিয়ানদের এক তাঁবুতে গিয়ে সেখান থেকে খরগোস চুরি করে আনত। কিন্তু বরফ গলার আর নদীতে স্রোত সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো তাঁবু গুটিয়ে সরে পড়েছে, সেখানকার খাবারের উৎস শুকিয়েছে।

পাঁশুটে বাচ্চাটা যখন আবার জীবন ফিরে পেল, আবার যখন অদূরের আলোর দেয়ালটা ওর চোখে ভেসে উঠল, তখন ও দেখল তাদের দল অনেকটা ছোট হয়ে গিয়েছে। একটি মাত্র বোন ছাড়া আর সব ভাই বোন ওকে ছেড়ে গেছে। ক্রমে ওর শক্তি বাড়তে লাগল, কিন্তু খেলার সঙ্গী ওর কেউ নেই,—ছোট্ট বোনটি তার নড়ে না, মাথাও তোলে না। আবার প্রচুর খাদ্য মিলতে লাগল। ওর শরীর মোটা হতে লাগল, কিন্তু বোনটির জন্যে খাদ্য মিলেছে বড়ো দেরি করে। সে শুধু শুকোয়, জিরজিরে কখানা হাড়ের ওপর খসখসে চামড়া বাঁধানো তার শুকনো শরীর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে মাটিতে।—টিমটিম করে জ্বলতে জ্বলতে শেষ পর্যন্ত একদিন তার প্রাণ-প্রদীপটি নিভে যায়।

তারপর আবার এক সময় এল যখন একদিন আলোর দেয়ালের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ওর বাবা আর ফিরে দেখা দিল না। দ্বিতীয়বারের দুর্ভিক্ষের পরের ঘটনা এটা। মাদী নেকড়েটা জানত কোথায় অদৃশ্য হয়েছে এক-চোখো, কিন্তু সে কথা সে মা হয়ে বাচ্চাকে জানায় কেমন করে? নিজেই সে মাংস খুঁজতে বেরিয়েছিল; মজা নদীর বাঁ ধার দিয়ে বনবিড়ালের বাসার কাছ পর্যন্ত সে গিয়েছিল এক-চোখোর পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে। সেখানে সে দেখল তার সন্তানের বাবার দেহাবশেষ ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে। চিহ্ন রয়েছে সাংঘাতিক লড়াই-এর, যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জিতে বনবিড়াল তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। বনবিড়ালের গর্তটাও মাদী নেকড়ে খুঁজে পেয়েছিল, বুঝেছিল শত্রু গর্তের মধ্যেই আছে; তবে ঢুকতে সাহস করেনি।

এরপর থেকে শিকার খুঁজতে গিয়ে মাদী নেকড়ে নদীর বাঁ ধারটা কখনো মাড়াত না। বনবিড়ালের গর্তে তখন এক গাদা বিড়াল-বাচ্চা, আর বনবিড়ালের মতো সাংঘাতিক হিংস্র আর বদমেজাজী প্রাণীর জোড়া নেই। গোটা ছয়েক নেকড়ে একসঙ্গে মিলে একটা বনবিড়ালকে তাড়িয়ে গাছের মাথায় তুলে দেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু একলা একটা নেকড়ের পক্ষে একটা বনবিড়ালের সঙ্গে লড়াই করা অন্য কথা—বিশেষ করে তখন যদি তার আবার এক গণ্ডা বাচ্চা থাকে।

কিন্তু মায়ের ভালোবাসা এমনি যে, সভ্য মা-ই হোক আর বন্য মা-ই হোক, সন্তানকে তার দেখতেই হবে। সব-হারানো বাপমরা একটি বাচ্চার জন্যে মাদী নেকড়েকে খুব ভয় পেলে চলে না, এমন দিন যায় যেদিন বন-বিড়ালের আতংককে উপেক্ষা করে নেকড়ে-মা নদীর বাঁ দিক ঘেঁসেও শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।

আলোর দেয়াল

গুহা ছেড়ে মা বার হয় শিকারের সন্ধানে, বাচ্চাটা জানে তার পক্ষে বার হওয়া বারণ। কাজটা যে অন্যায়, তা কেবল সে মা-র কাছে চড়চাপড় খেয়ে শিখেছে তাই নয়, বাচ্চাটার মনে জন্ম নিচ্ছে ভয়ের অনুভূতি। তার এই কদিনের গুহাশ্রয়ী জীবনে এমন কিছু ঘটেনি যাতে সে ভয় পেতে পারে। তবু তার মনে বাসা বেঁধেছে ভয়। হাজার হাজার প্রাক্তন নেকড়ে-জীবনের মধ্যে দিয়ে, একচোখো আর মাদী নেকড়ের রক্তের ধারা বেয়ে তারও রক্তে আপনা-আপনি ভয় সঞ্চারিত হয়েছে। এই ভয় তার একান্ত উত্তরাধিকার।

কিসের থেকে ভয়ের সৃষ্টি তা না বুঝলেও ভয়ের উপলব্ধি বাচ্চাটার ইতিমধ্যেই হয়েছে। জীবনের নানা বাধার মধ্যে একটি বাধা হচ্ছে এই ভয়। খিদে পায়, খিদে মেটানোর খোরাক না পাওয়া জীবনের একটা মস্ত বাধা। গুহার দেয়ালের কাঠিন্য, মা-র নাকের ধাক্কা থাবার চাপড়, দুর্ভিক্ষের খিদে—এদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, এটুকু বুঝেছে পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বাধীনতা নেই, কষ্ট আছে, বাধা আছে। আর বাধা-নিষেধগুলোই তো আইন, আইন যদি মেনে চলো তো সুখ পাবে, আঘাত এড়াতে পারবে।

এক আইন মা-র নিষেধের, আর এক আইন নামহীন ভয়ের। এই দুই আইন মান্য করে বাদামী বাচ্চাটা গুহার মুখের দিকে পা বাড়ায় না। সেখানে রয়েছে সাদা দেয়ালটা।

একদিন জেগে চুপটি করে যখন সে শুয়ে আছে, হঠাৎ শুনল সামনের সাদা দেয়ালটার কাছে অদ্ভুত একটা শব্দ। কিসের শব্দ ওটা? গুহার

বাইরে দাঁড়িয়ে, আর-একটা নেকড়ের ছানা সাহস করে ডাকছে আর কাঁপছে, আর গুহার ভেতরে কী আছে দেখবার চেষ্টা করছে। বাদামী বাচ্চাটা কিন্তু চেনে না ওটাকে,—তার নাকে কেবল এল অপরিচিত একটা গন্ধ, কানে এল অজানা গর্জন। যা সে চেনে না, সেই অপরিচয়ের উপলব্ধি ভয়ের ধাক্কা দিল বাচ্চাটার মনে, নিজের অজ্ঞাতে তার পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সে কি জানত যে একটা অপরিচিত নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দে পিঠের লোম তাকে খাড়া করতে হবে? তা নয়, এ তার ঐ নবলব্ধ ভয়েরই বাহ্যিক প্রকাশ। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি স্বাভাবিক বুদ্ধি তার মনে সাড়া দিল—আত্মগোপন করার বুদ্ধি। আতংকে সে আকুল হয়ে উঠেছে, তবু সে নিশ্চল পাথরের মতো হয়ে নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল, যেন সে মড়া। তার মা ফিরে এসে আগন্তুক নেকড়েটার গন্ধ টের পেয়ে রাগে গর্ গর্ করতে লাগল, তারপর এক লাফে গুহার মধ্যে ঢুকে বাচ্চাটাকে পেয়ে তাকে ঘন ঘন চাটতে আর আদর করতে লাগল আনন্দের আবেগে। বাচ্চাটা বুঝতে পারল, যে করেই হোক একটা মস্ত ফাঁড়া তার কেটেছে।

কেবল বিধিনিষেধের উপলব্ধি ছাড়াও অন্যান্য শক্তিও বাচ্চাটার মধ্যে কাজ করতে সুরু করেছে—এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো শক্তি হোলো—বড় হবার বেড়ে ওঠবার প্রেরণা। তার ভিতরের অনুভূতি আর বাইরের বাধা তাকে বলছে বিধিনিষেধ মান্য করাই তার কর্তব্য। আবার বাড়বার প্রেরণা তাকে বলছে,—অমান্য করো, এগিয়ে চলো। তার মায়ের ধমক আর ভয়ের শাসন তাকে সামনের সাদা দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু জীবনের ধর্ম বেড়ে ওঠা, জীবন চায় আলোর সন্ধান। প্রতিবার খাদ্যের গ্রাসের সঙ্গে, প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার ছোট্ট দেহটির মধ্যে জীবনের যে জোয়ার উঠছে, সে জোয়ার বন্ধনহীন। এই জীবনের

জোয়ার একদিন ভয়-বাধার নিগড় ভাসিয়ে দিল, বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল সাদা দেয়ালের দিকে।

এ-দেয়ালটা আশ্চর্য। অন্য দেয়ালের মতো নয় মোটেই। যতো সে এগোয়, দেয়ালটা ততোই পিছিয়ে যায়। কোনো শক্ত বস্তুতেই ধাক্কা খায় না তার নরম নাক। বাড়তে থাকে সাদার ঔজ্জ্বল্য, চোখ তার ধাঁধিয়ে যায়। বিভ্রান্ত চোখে বাচ্চাটার বিস্ময়ের ঘোর বেড়েই চলে। ভয় তার পা টেনে ধরে, জীবনের বিস্ময় তাকে ঠেলে নিয়ে চলে সামনে।

হঠাৎ সাদা দেয়ালটা কতো দূরে যেন ছিটকে গিয়ে পড়ল। চারদিকে চোখ-ধাঁধানো যন্ত্রণাদায়ক আলো। আর স্তম্ভিত হতে হয় দেয়ালের দিগন্ত-জোড়া বিস্তার দেখে—স্থানের যেন আর সীমা-পরিসীমা নেই। আলোর ঔজ্জ্বল্য আর সীমানার দূরত্বকে সহ্য করে নিতে সময় লাগল কিছুটা বাচ্চাটার চোখের। প্রথম তার মনে হয়েছিল সাদা দেয়ালটা বুঝি এক লাফে দৌড়ে চলে গেছে অনেক সামনে, এখন আবার সেই অনেক দূরের সামনেটা তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। দেয়ালটা আর সাদা নয়, সেখানে গাছের সারি, নদীর কিনার, তার পারে খাড়া পাহাড়ের ধার,—সব শেষে নীল আকাশ।

বিরাট আতংকে বুক কেঁপে উঠল বাচ্চাটার। এমনি ভয়ানক অজানার মুখোমুখি কখনো সে হয়নি। গুহার মুখে গুঁড়ি মেরে বসে সে সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ভয় করবে নাই-বা কেন? যা সে দেখছে, তার কিছুই সে চেনে না; আর যা অচেনা, তাইতো শত্রু! তার পিঠের প্রত্যেকটা লোম আবার সোজা খাড়া হয়ে উঠল, দুর্বল দুটো ঠোঁট কুঁকড়িয়ে সে এক সাংঘাতিক ভয়-দেখানো ডাক ছাড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। তার ক্ষুদ্রতা আর নিঃসহায় আতংক দিয়ে সে-ই যেন সারা বিরাট দুনিয়াটাকে ভয় দেখাতে চায়।

কিছুই হোলো না। বরং নতুন দৃশ্য চোখ ভরে দেখার আগ্রহে বন্ধ

হয়ে এল তার গোঁ গোঁ আওয়াজ। মন দিয়ে সে কাছের জিনিষগুলো দেখতে লাগল, চোখে স্পষ্ট ভেসে উঠল রৌদ্রজ্বলা নদীর একটা অংশ, কিনারে একটা শুকনো পাইন-গাছ আর ঠিক গুহার ধারে তার পায়ের কাছ থেকেই সুরু হওয়া ঢালু জমি। গুহার সামনেই হাত দুয়েক গর্ত, তারপর ঢালু মাঠের সুরু। সাহসে ভর করে এগোতেই বাচ্চাটা গুহার মুখ থেকে সোজা মাথা নিচু করে আছাড় খেল মাটিতে। নাকটা থেঁতলে গেল শক্ত জমির ওপর, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল বেচারী। এতেও নিস্তার নেই, ঢালুর ওপর দিয়ে এবার সে গড়িয়ে চলল সোজা। অজানা এবার তাকে চেপে ধরেছে, নিয়ে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে, একেবারে শেষ করবে তাকে ভীষণ আঘাতে। কোথায় গেল তার সাহস; আতংকে রুদ্ধ কণ্ঠে কুকুর-ছানার মতো সে গড়াচ্ছে আর চিঁ চিঁ করে কাঁদছে। এ ভয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না, কান্না ছাড়া গতি নেই।

ঢালুটা ক্রমে সরল হয়ে এল, তারপর ঘাসে ঢাকা সমান জমি। গতি রুদ্ধ হয়ে এল বাচ্চাটার। গড়ানো যখন শেষ পর্যন্ত থামল তখন সে একবার জোর চীৎকার ছেড়ে ফোঁস ফোঁস করে নাকি-কান্না কাঁদতে লাগল। কাঁদে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর জিভ দিয়ে গা চাটে বার বার।

একটু পরে সোজা হয়ে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল। আশ্চর্য! অজানার পাকচক্রে সে পড়েছে,—চলে এসেছে সে কোথায়! কিন্তু লাগেনি তো! ভয়কে সে তো জয় করেছে! স্বধু কৌতূহল। দেখল পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, অদূরে একটা মস্‌বেরীর চারা, ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে আকাশে ঠেলে-ওঠা পোড়া পাইন গাছটার শুকনো মোটা গুড়ি। গুড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালী এক ছুটে নেমে এসে বাচ্চাটার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। হঠাৎ ভয়ে গুঁড়ি মেরে গোঁ গোঁ করে উঠল বাচ্চাটা। কাঠবিড়ালীও কম

ভয় পায়নি; দৌড়ে সে উঠে গেল গাছের ওপর, নাগালের বাইরে পৌঁছে ধমক দিতে লাগল বাচ্চাটাকে।

ভরসা বাড়ল বাদামী বাচ্চার। একটা কাঠঠোকরা হঠাৎ তাকে চমকে দিলেও এবার সে সাহসে ভর করে দু-পা এগোলো। এবার তার সামনে আস্ফালন করে দাঁড়াল একটা অজানা পাখি। বাচ্চাটা তার দিকে থাবা বাড়াতেই ঠিক নাকের ডগায় খেল পাখিটার শক্ত ঠোঁটের এক ঠোকর। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল বাচ্চা, সেই শব্দে পাখিটাও উড়ে পালাল।

এমনি করে শিক্ষা হচ্ছে বাচ্চাটার। তার ছোট্ট ঝাপসা মনের অবচেতনে মোটামুটি কয়েকটা ধারণা এরই মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে। সে বুঝেছে—বস্তু দুরকমের। কোনোটা জীবন্ত আর কোনোটা জীবন্ত নয়। যারা জীবন্ত নয় তারা এক জায়গাতেই থাকে,—কিন্তু জীবন্ত যারা, তারা কখন কী যে করে ঠিক নেই। তারা চমক লাগায়; তাদের জন্যে প্রতি মুহূর্তে তৈরি থাকা চাই।

আবার এগোল বাচ্চা। ভালো করে সে চলতে পারে না। কোন্ জিনিষটা কতো দূরে, চোখ এখনো ঠিক ধারণা করতে শেখেনি; তাই এটায়-ওটায় ধাক্কা খায়। পায়ে ঠোক্কর লাগে, নুড়ি পাথর সর্ সর্ করে সরে যায়, চলতে চলতে হড়কে যায় কখনো শিখছে সে হাঁটতে, যতো এগোচ্ছে হাঁটা তার ক্রমেই ভালো হচ্ছে; সামনের জিনিষের দূরত্বের পরিমাণ, নিজের শক্তির পরিমাণ, পথের বৈচিত্র্য,—সব ক্রমে ক্রমে সে বুঝছে।

প্রথম শিক্ষার্থীর সৌভাগ্য বাচ্চাটারও। মাংস-শিকারী হবার জন্যে সে জন্মেছে। প্রথম যেদিন গুহা থেকে উন্মুক্ত পৃথিবীতে সে পা বাড়িয়েছে সেইদিনই শিকার তার জুটল। নিতান্ত ভুল করেই সে একটা বনমুরগীর গোপন বাসায় গিয়ে পড়ল। একটা বাসার মধ্যে সাত-সাতটা ছানা।

চিৎকার করছে ছানাগুলো। দেখল সে, তার চেয়েও অনেক ছোট্ট ক-টা প্রাণী, নড়ছে চড়ছে, চিঁচিঁ করে চেঁচাচ্ছে। একটা ছানার ওপর সে থাবা রাখল, ছানাটার ছটফটানিতে আমোদ লাগল তার। নাক দিয়ে শুঁকলো, তুলে নিল দাঁতের মাঝখানে। ছানাটার ছটফটানিতে জিভে সুড়সুড়ি লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে জাগছে চেনা একটা অনুভূতি,—সে অনুভূতি ক্ষুধার। নেকড়ের ছানা দাঁতে দাঁত চাপল শক্ত করে, মুড় মুড় করে ভাঙল নরম হাড়, মুখ ভরে গেল গরম রক্তের স্রোতে। কী চমৎকার স্বাদ! কি মধুর মাংস! মা যে খাবার দেয় ঠিক তেমনি, অথচ তার চেয়েও টাটকা, জীবন্ত প্রাণীর কিনা! ছানাটাকে চেটে পুটে সে খেল। তারপর একে একে বাকি ছটা ছানাকে সাবাড় করে ঠিক তার মায়েরই ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটতে চাটতে সে ঝোপের মধ্যে থেকে গুঁড়ি মেরে বার হোলো।

হঠাৎ সে পড়ে গেল পালকের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে। পালকের ঝড়ে ডানার ঝাপটে দিশেহারা হয়ে পড়ল নবীন শিকারী। থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে গুঁড়ি মেরে সে আর্তনাদ করতে লাগল। আঘাত কিন্তু বাড়তেই লাগল। মা-পাখিটা এসেছে রাগে শোকে আগুন হয়ে। হঠাৎ নেকড়ের বাচ্চাও তেতে উঠল, খাড়া হয়ে উঠে গোঁ গোঁ শব্দে সে থাবা তুলে এগোলো। মা-পাখিটার একটা ডানায় দাঁত বসিয়ে সে টানতে আরম্ভ করল। পাখিটা মুক্ত ডানাটার ঝাপটে তাকে মারতে লাগল ক্রমাগত। নেকড়ে-বাচ্চার জীবনে এই প্রথম লড়াই, সে ভুলে গেল অজানাকে, দূর করে দিল মন থেকে সমস্ত ভয়। একমাত্র সে বুঝেছে, —লড়ছে সে, লড়ছে জীবন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে। খুনের নেশায় আগুন হয়ে উঠল সে। খুসিতে মশগুল হয়ে উঠল তার প্রাণ। ছোট প্রাণী-গুলোকে সে মেরেছে, এবার বড় প্রাণীটার পালা। লড়াই-এর উদ্দীপনায়, যুদ্ধের উল্লাসে আত্মহারা হয়ে সে লড়তে লাগল।

চোয়ালের ফাঁকে পাখীর ডানাটাকে মরণ-কামড় দিয়ে সে ধরে আছে, অস্ফুট গোঁ গোঁ আওয়াজ বার হচ্ছে বন্ধ মুখ থেকে। পাখিটা তাকে প্রথমে ঝোপ থেকে টেনে বার করে এনেছিল। আবার ঝোপের দিকে সরবার চেষ্টা করামাত্র সে সেটাকে টানতে টানতে ফাঁকা যায়গায় এনে ফেলল। পাখিটা একটা ডানা সমানে ঝাপট মেরে চলেছে আর চিৎকার করছে প্রাণপণ, গুচ্ছ গুচ্ছ পালক ঝরছে সাদা তুষারের মতো। বাচ্চাটা বাচ্চা হলে কী হয়, সে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। জাতে সে নেকড়ে,—নেকড়ে-জাতের লড়াই-এর রক্ত তার শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটছে। এই তো বাঁচার মতো বাঁচা, এই তো তার জীবনের সুস্পষ্ট অর্থ! মাংস সংগ্রহ আর সেই মাংস শিকারের জন্যে আপ্রাণ লড়াই—এই তো তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য—এই তো তার জীবনের চূড়ান্ত আত্মঘোষণা! জীবনের চরম লক্ষ্যের সন্ধান সে পেয়েছে,—লড়ছে মরীয়া হয়ে।

খানিকক্ষণ পরে পাখিটার ছটফটানি থামল। মাটিতে শুয়ে হিংস্র চোখে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার চোয়ালের মাঝখানে পাখির ডানাটা তখনো সে চেপে ধরে আছে, আর দাঁতের ফাঁকে বিষম ভয়-দেখানো গোঁ গোঁ আওয়াজ বার করছে। এবার ঠোকরে ঠোকরে পাখিটা তার নাক মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। গোঁ গোঁ গর্জন কেঁউ কেঁউ ক্রন্দনে পর্যবসিত হোলো। লড়াইএর নেশা এতক্ষণে কেটেছে বাচ্চাটার, শিকার ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত কাপুরুষের মতো পিছু হটে ল্যাজ গুটিয়ে সে দৌড় দিল ফাঁকা মাঠে।

প্রান্তরের অপর দিকে ঝোপের ধারে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বাচ্চাটা। লম্বা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তার ছোট্ট বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, ঝুলে পড়েছে জিভ, যন্ত্রণায় টন টন করছে নাগের ডগা। কিছুক্ষণ শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ তার মনে হোলো, কোথা থেকে কী ভয়ানক

বিপদ যেন তার মাথায় ভেঙে পড়ল বলে। আবার বুঝি তাকে চেপে ধরল অজানার আতংক। যেন নিজের অজান্তেই সে কুঁকড়ে ঢুকে গেল ঝোপের আড়ালে। পরমুহূর্তেই ঝড়ের মতো এক ঝলক গরম হাওয়া লাগল তার গায়ে, বিরাট কালো একটা ডানাওয়ালা প্রাণী তার ঠিক সামনে ভয়াবহ বেগে নেমে এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে আবার নিঃশব্দে প্রচণ্ডগতিতে অপসৃত হয়ে গেল। আকাশের একটা বাজপাখি ছোঁ মেরেছিল তার ওপর, এক লহমার জন্যে সে বেঁচে গেছে। দ্বিতীয়বার ছোঁ মারল বাজপাখিটা, ঠোঁটে চেপে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘা-খাওয়া পাখিটাকে।

বেশ অনেকটা সময় বিশ্রাম করার পর বাদামী বাচ্চা আশ্রয় থেকে বার হোলো। অনেক শিক্ষা তার হয়েছে। জীবন্ত জিনিষ মানেই হোলো মাংস, যা খেতে ভালো। কিন্তু জীবন্ত জিনিষ যদি নিজের চেয়ে বড়ো চেহারার হয়, তাহলে তার হাত থেকে মার খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব পাখির ছানার মতো ছোট ছোট জীবন্ত প্রাণী খাওয়াই ভালো, মা-পাখির মতো বড়োসড়ো জীবন্ত প্রাণীকে ঘাঁটানো বুদ্ধির কাজ নয়। তবু মা-পাখিটার সঙ্গে আর একবার লড়াই করে দেখলে হোতো। কিন্তু বাজপাখি তো সেটাকে নিয়ে সরেছে। দেখা যাক, আর কোনো মা-পাখির সাক্ষাৎ মেলে কিনা।

নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল বাচ্চা। জল সে চেনে না, কখনো দেখেনি আগে। ভালোই লাগল তার। কেমন মসৃণ, উঁচু নিচু নেই, পরিষ্কার। সোজা সে এগোল, আর পরমুহূর্তেই একটি মাত্র চিৎকারের সুযোগ পেতে না পেতেই তলিয়ে গেল অজানার গহ্বরে। তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করতেই নাক মুখ দিয়ে তার বুকে পেটে ঢুকতে লাগল ঠাণ্ডা জল। দম বন্ধ হয়ে এল, এবার বুঝি মৃত্যু। মৃত্যু কী তা বাচ্চা জানেনা, তবে জঙ্গলের সব প্রাণীর মতোই মৃত্যুর আবছায়া ধারণা তারও মনে এরই মধ্যে গজিয়েছে। সে বোঝে, সব

আঘাতের চরম আঘাত মৃত্যু, সব অজানার কেন্দ্রস্থলে মৃত্যুর আসন, সব আতংক পুঞ্জীভূত হলে আসে মৃত্যুর শেষ আতংক। জানে না মৃত্যু কী, এটুকু বোঝে যে একেই করতে হয় চরম ভয়,—এ হচ্ছে অনির্বচনীয়, অচিন্ত্যনীয়, অপরিসীম, সর্বনাশ। একে এড়ানোই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা, জীবনের প্রতি মুহূর্তের সজাগ আকাংক্ষা।

জলের ওপর ভেসে উঠতেই মধুর বাতাসে তার বুক ভরে গেল। আর সে ডুবল না,—যেন কতোদিনের পুরোণো অভ্যাস, তেমনি করে চার পা ছুঁড়ে সাঁতার দিতে লাগল। মাত্র এক হাত দূরে পিছন দিকের নদীর তীর তার চোখে পড়ল না, সাঁতার দিতে লাগল সামনে ওপারের দিকে।

শীর্ণ নদীটার মাঝামাঝি পৌঁছতেই তরঙ্গ তাকে তুলে নিল, ভাসিয়ে নিয়ে চলল ঢালু স্রোতে। স্রোত বাড়ছে, সাঁতার কাটার উপায় নেই ;—টেনে নিয়ে চলেছে বাচ্চাকে ত্বরিতবেগে, আছড়ে ফেলছে পাথরের ওপর, আবার ঠেলে নিয়ে চলছে ঢেউএর ধাক্কায়। যতোবার বাচ্চাটার নরম শরীর পাথরে পাথরে ঘা খাচ্ছে, ততোবার কাতর আর্তনাদ করে উঠছে সে।

ঢালু স্রোতের নিচে ছোট্ট হ্রদের মতো শান্ত নদীর জল। সেখানে পৌঁছে বাচ্চাটা বাঁচল, তারপর আছাড় খেয়ে পড়ল বালি-কাঁকরের তীরভূমিতে। ভয়ে পাগল হয়ে কোনো রকমে জলের ধার থেকে গুঁড়ি মেরে উঠে কাঁকরের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে ধুঁকতে লাগল। এই দুনিয়াটার সম্বন্ধে আরো কিছু জ্ঞান তার হোলো। সে চিনল জল। অজানাকে বাচ্চাটা ভয় করেছে, সন্দেহ করেছে—এবার অভিজ্ঞতা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে শিখছে।

আর-একটা বিপদের পালা সেদিন তার ভাগ্যে ছিল। এতক্ষণ পরে হঠাৎ তার মনে পড়ল সংসারে তার মা বলে কেউ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাকুল প্রাণ বলে উঠল,—সংসারে আর কিছু সে চায় না, শুধু মাকে

চায়। কেবল যে এত বিপদ আর পরিশ্রমে দেহ তার কাতর তা নয়, তার ছোট্ট মস্তিষ্কও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘুমে তার চোখ জুড়ে আসছে। কোথায় তার গুহা আর কোথায় তার মা—সেই সন্ধানে সে বার হোলো, তার ছোট্ট মনটি ভারি হয়ে উঠল নিঃসহায় মন-কেমন-করা কারুণ্যে।

কয়েকটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলেছে, এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ হিংস্র চিৎকারে সে থমকে দাঁড়াল। তার চোখের সামনে হলুদ রঙের এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন ছুটে গেল। সে দেখল, ঠিক তার সামনে দিয়ে চাবুকের মতো সরে গেল একটা নেউল। ঐটুকু একটা ছোট প্রাণী, ওটাকে আবার ভয়! তারপরে সে দেখল তার পায়ের কাছে সেই রকমই আর একটা প্রাণী, তবে আরো, আরো অনেক ছোট, মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা। এটা একটা ছানা-নেউল, তারই মতো বাসা ছেড়ে বাইরে এসেছে বৈচিত্র্যের সন্ধানে। ওটা তার সামনে থেকে পালাবার চেষ্টা করতেই সে থাবা দিয়ে ওটাকে উল্টে ফেলল। কেমন অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চিৎকার করল বাচ্চা নেউলটা···! সঙ্গে সঙ্গে হলুদ বিদ্যুৎরেখা তার চোখের সামনে আবার ঝলসে উঠল। তীব্র গর্জন করে মা-টা তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে এসে পড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে তার গলাটা কামড়ে ধরল।

আর্তনাদ করে দু-পা পিছিয়ে যেতেই তাকে ছেড়ে মা-টা ছানাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে নিয়ে ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল! নেউলের কামড়ে তার গলায় যতো না ব্যথা লেগেছে, চোট লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশি তার আত্মসম্মানে। এত ছোট চেহারার একটা জন্তু, এতটা তার প্রতাপ! বাচ্চাটা তখনো জানত না যে চেহারায় ক্ষুদ্র হলে কি হয় নেউলের মতো দুর্দমনীয় হিংস্র আর সাংঘাতিক

প্রাণীর জুড়ি সারা জঙ্গলের রাজ্যে নেই। জ্ঞানচক্ষু ফুটল একটু পরেই।

বাচ্চাটা বসে বসে কিঁউ কিঁউ করছে, এমনি সময়ে ফিরে এল মা-নেউল। এবার ওর প্রতিহিংসা নেবার পালা। নিঃশব্দে, পরম সাবধানে শুঁড়ি মেরে ও এগোতে লাগল। লিকলিকে সাপের মতো চেহারা, সর্পিল কুটিল হিংসাজর্জর মুখের ভাব, চোখের চাউনি। ওর তীক্ষ্ণ ভীষণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল, সে দাঁত বার করে গর গর শব্দ করে ওকে ভয় দেখাতে লাগল। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগল নেউল। তারপর ধাঁ করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে এক লাফে সে বাচ্চাটার ওপর পড়ল, ধারালো দাঁতের মোক্ষম কামড়ে ধরল তার গলা।

বাচ্চাটা প্রথমে গর্জন করে উঠল, চেষ্টা করল যুদ্ধ করতে। কিন্তু কতোটুকু সে আর, একদিনের তো মাত্র তার অভিজ্ঞতা। একটু পরেই গর্জনের বদলে কান্না ফুটে উঠল তার গলায়। লড়াই ছেড়ে পালাবার জন্যে সে হয়ে উঠল ব্যাকুল। কিন্তু নেউলএর কামড় ছাড়বার নয়। ও ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগল দাঁতের ফাঁকে বাচ্চার গলার নলীটা চেপে ধরবার জন্যে। নলীটা ছিঁড়তে পারলেই টাটকা রক্ত ও চোঁ চোঁ করে পান করবে, রক্তের সঙ্গে শুষে নেবে ওর শিকারের জীবন।

বাদামীর বাচ্চাটার বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। তাকে নিয়ে গল্প লেখারও আর দরকার হোতো না, যদি না ঠিক এই মুহূর্তে তার মা এসে পড়ত। মা-নেকড়েকে দেখে নেউল বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল মা-টার ওপর। মাদী নেকড়ের গলাটা ধরতে না পেরে কামড় বসালো তার চোয়ালের ওপর। এক ঝটকায় মাদী নেকড়ে ওটাকে ছুঁড়ে দিল আকাশে, তারপর মাটিতে পড়বার আগেই

ওর সরু হলদে দেহ ধরা পড়ল নেকড়ের দুই চোয়ালের ফাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে একটিমাত্র কামড়ের চাপে নেউলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

মা বাচ্চাকে আবার আকুল আগ্রহে আদর করতে লাগল কতক্ষণ ধরে। মাকে পেয়ে সে যতো না খুসি, তাকে পেয়ে তার শতগুণ আনন্দ মা-র। কতো আদর মা তাকে করল, শুঁকল, থাবা বুলোলো সর্বাঙ্গে, যেখানে যেখানে কেটে ছড়ে গিয়েছে জিভ দিয়ে চেটে চেটে দিল তারপর মা আর বাচ্চা মুখোমুখি বসে মরা নেউলটাকে পেটে পূরে খোসমেজাজে গুহাতে ফিরে গেল। ঘুমিয়ে পড়তে একটুও দেরি হোলো না দুজনের।

শিকারের নীতি

বাড়ন্ত বাচ্চাটা গুহায় শুয়ে বিশ্রাম করল দুটো দিন। তারপর দিন সে আবার গুহা থেকে বার হোলো। প্রথমেই তার সামনে পড়ল সেই ছানা-নেউল, যার মাকে কদিন আগে সে আর তার মা মেরে খেয়েছিল। ছানাটারও ওর মা-র পরিণতিই হোলো। বাদামী বাচ্চা সেদিন আর পথ হারালো না। কিছুটা ঘুরে ক্লান্ত হতে না হতেই সে গুহায় ফিরে এসে ঘুম লাগাল। এমনি করে প্রতিদিনই সে বার হতে লাগল, তার ভ্রমণের পরিধিও দিনে দিনে বড় হয়ে চলল।

নিজের কতোটা শক্তি আর কতোটা দুর্বলতা, এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে বাচ্চাটা শিখছে, ধরতে পারছে কখন কতোটা সাবধান হতে হবে আর কখন এগোতে হবে সাহস করে।

তার শিকারের ভাগ্যটা প্রথম দিনে যে খুব ভালো ছিল তাতে সন্দেহ নেই। একদিনে সাতটা বনমুরগীর ছানা আর একটা বাচ্চা নেউল সেদিন মেরেছিল। হত্যার ক্ষুধা দিনে দিনে তার বেড়েই চলল। আর বাড়তে লাগল তার রাগ কাঠবিড়ালীর ওপর। ওটাই না ডাক ছেড়ে আর সব্ সব্ শব্দে দৌড়ে পালিয়ে সবাইকে সচেতন করে দেয় যে নেকড়ের বাচ্চা বেরিয়েছে! গোপনে চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে কাঠবিড়ালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া অসম্ভব। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে, কাঠবিড়ালীও তেমনি তার সাড়া পেলেই এক লহমায় নাগালের বাইরে গাছের মগডালে গিয়ে ওঠে।

মায়ের ওপর ভক্তিশ্রদ্ধার সীমা নেই বাচ্চাটার। সে জানে শিকারে মা-র আর জুড়ি নেই। মাংসের ভাগ মা তাকে একদিনও দিতে ভোলে না। তাছাড়া ভয় বলে কিছু নেই মা-র প্রাণে। বুদ্ধি আর

অভিজ্ঞতা .দুইয়ের সংযোগেই যে মা-র প্রাণে এতটা সাহস. তা সে বোঝে না। সে বোঝে নির্ভীকতা মানেই শক্তি, আর শক্তি তার মা-র। মা-র শক্তির পরিচয় বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের ওপরও সে পাচ্ছে ; মা তাকে আজকাল আর নাকের ধাক্কা দিয়ে মিষ্টি শাসন করে না, হয় দেয় কড়া থাবার চাপড়, না হয় ধারালো দাঁতের কামড়। শাসন যতো কড়া হচ্ছে, মার ওপর ভক্তিও বাচ্চার ততোই বাড়ছে ;—যতো সে বড়ো হচ্ছে মা-র মেজাজও ততো রুক্ষ হয়ে উঠছে।

আবার দুর্ভিক্ষ এল। ক্ষুধার জ্বালার ধারণা এবার আর বাচ্চাটার অস্পষ্ট রইল না। শিকারের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে মাদী নেকড়েটা রোগা জিরজিরে হয়ে গেল। দিনে রাত্রে সমানে মাংসের সন্ধানে জঙ্গলে জঙ্গলে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, গুহায় ঢুকে ঘুমোবার সময়ই তার হোতো না। তার স্তনে এক ফোঁটা দুধও আর রইল না, বাচ্চাটার জন্যে এক কামড় মাংস জোগাড় করাও দিনে দিনে তার কঠিন হয়ে উঠল।

এতদিন বাচ্চাটার কাছে শিকার ছিল একটা খেলা। এবার শিকারে ঝুঁকল প্রাণের দায়ে, কিন্তু শিকার এখন আর মেলে না। এবার সে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল ব্যর্থ উদ্যমের প্রেরণায়। কাঠবিড়ালীর ভাবগতিক আরো মনোযোগ দিয়ে সে লক্ষ্য করতে লাগল, যাতে একটাকে অতর্কিতে নাগালের মধ্যে পায়। আর কাঠঠোকরার চালচলনও সে শিখতে লাগল, চেষ্টা করতে লাগল মাটি খুঁড়ে বন-ইঁদুর ধরতে। ক্রমে ক্রমে এমন হোলো যে বাজপাখীর ছায়াতে আর সে ভয় পায় না, আর লুকোয় না ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে। শুধু যে বুদ্ধি আর সাহস তার বাড়ছে তাই নয়, মরীয়া হয়ে উঠছে সে। ফাঁকা জায়গায় সোজা হয়ে নির্ভীকভাবে বসে সে আকাশের বাজপাখিকে আমন্ত্রণ জানায়। নীল আকাশে যে উড়ছে সেও তো মাংস, তারই জন্যে তার পেটের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে উঠছে সর্বক্ষণ। কিন্তু আকাশের পাখিও আর তার সঙ্গে লড়াই করতে

নিচে নামে না। মাথা তুলে তৃষিত দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে শেষ পর্যন্ত সে গুঁড়ি মেরে ঝোপের মধ্যে ঢোকে, হতাশার বেদনায় আর ক্ষুধার তাড়নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে।

এমনি কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যে একদিন মাদী নেকড়েটা শিকার নিয়ে ঘরে ফিরে এল। অদ্ভুত প্রাণী, এমনি শিকার বাচ্চাটার পেটে আর কোনো দিন যায়নি। প্রায় বাদামী বাচ্চাটারই বয়সী, তার চেয়ে অনেকটা ছোটখাট চেহারার একটা বাচ্চা। পুরো শিকারটাই তার একলার খাবার। সে কি জানত যে বনবিড়ালের বাকি সব কটা বাচ্চাকে তার মা সাবাড় করে এসেছে? এও সে বোঝেনি, কতোটা নিরুপায় হয়েই যে তার মা এতটা অসমসাহসিক কাজেও পেছপাও হয়নি। মরা বাচ্চাটার ভেলভেটের মতো নরম চিকণ চামড়া, তার নিচে সুস্বাদু মাংস। প্রতি গ্রাসে আনন্দ আর আরাম। পেট ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার প্রতি অঙ্গ শিথিল হয়ে এল আয়েসে। মা-র গরম দেহে গা মিলিয়ে সে চোখ বুজল।

হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল মা-র গর্জনে শুনে। মা-র গলার এমনি বিরাট গর্জন আগে সে আর কখনো শোনেনি। মাদী নেকড়েও বোধহয় তার সারা জীবনে এমনি বিকট আওয়াজ গলা দিয়ে কোনোদিন বার করেনি। কারণ ছিল বৈকি এমনধারা গর্জনের, ভুল হয়নি মাদী নেকড়ের।

বনবিড়ালের বাসায় হানা দেয়ার ফল সোজা নয়, প্রতিফল পেতেই হয় হাতে হাতে। বিকেল বেলার জলজলে আলোয় সদ্যজাগা চোখ মেলে বাদামী বাচ্চা দেখল, তাদের গুহার মুখ জুড়ে গুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে আছে মা-বনবিড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আতংকে থর থর করে উঠল তার সারা শরীর, আচম্বিতে ঢেউ উঠল সারা পিঠের লোমে। গর্জন করে উঠল মাদী বনবিড়ালটা। বিকট তার আওয়াজ, সরু থেকে আরম্ভ হয়ে হঠাৎ ভাঙা

খচখচে মোটা গলায় তার পরিণতি। সে শব্দ শুনলে হিম হয়ে যায় বুকের ভেতরটা।

বাচ্চাটা সোজা হয়ে সাহসে ভর করে মা-র পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে ফোঁস ফোঁস করতে আরম্ভ করল। মা কিন্তু তাকে নিতান্ত অবহেলায় এক ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দিল, নিজে এগিয়ে গেল সামনে। গুহার মুখটা ছোট ; তার মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে ঢোকবার উপায় নেই। বনবিড়ালটা গুঁড়ি মেরে গুহার মধ্যে ঢুকতেই মাদী নেকড়ে এক লাফে ওটাকে আক্রমণ করল, চড়ে বসল বুকের ওপর। ভয়ে প্রাণপণে চোখ বুজল বাচ্চা, তার দু-কান জুড়ে বাজতে লাগল দুই জানোয়ারের বিকট তর্জন-গর্জনের দামামা। দুজনেই লড়ছে প্রাণপণ, বনবিড়ালটা তার চারপায়ের ধারালো নখে আর ধারালো দাঁতে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে নেকড়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নেকড়ে লড়ছে খালি দাঁত দিয়ে।

এবার বাচ্চাটা চোখ মেলে লাফিয়ে উঠে বনবিড়ালটার পিছন দিকের একটা পায়ে কামড় বসিয়ে দিল। মোক্ষম কামড়ে শত্রুর পা-টা ধরে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তার কামড়ে বনবিড়ালের একটা পা কাবু হয়ে রইল, তার মা-র পক্ষে সেটুকু সাহায্য কম নয়। লড়াইয়ের গতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে একবার সে দুই জানোয়ারের তলায় চাপা পড়ে গেল, কামড় থেকে খসে গেল বনবিড়ালের পা। পরমুহূর্তেই দুই মা জড়াজড়ি ছাড়িয়ে আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াল আর এ-ওর গায়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বনবিড়ালটা বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে চালালো থাবার একটা বিরাট থাপ্পড়। বাচ্চাটার একটা কাঁধের সমস্ত মাংস ছিঁড়ে হাড় বার হয়ে গেল, সে ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল গুহার দেয়ালে। লড়াইএর গর্জনের সঙ্গে মিশল আহত বাচ্চাটার করুণ আর্তনাদ। কে তার কান্না শোনে ? লড়াই থামবার নাম নেই। অনেক কান্না কাঁদবার

পর বাচ্চাটা আবার উঠে দাঁড়াল, সাহস করে এগিয়ে এল সামনে। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যন্ত শেষ হোলো, তখনো সে বনবিড়ালটার একটা পায়ে দুই দাঁতের মোক্ষম কামড়ে ঝুলছে আর অস্ফুট গোঁ গোঁ আওয়াজ বার হচ্ছে তার মুখে থেকে।

মরেছে বনবিড়ালটা। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জিতলেও মাদী নেকড়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ, প্রাণান্তকর অবস্থা। বাচ্চার আহত কাঁধটা কবার চেটে তাকে একটু আদর করে সে ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ল। এত রক্তপাতে তার শরীরে একটুও আর বল নেই। পুরো একদিন এক রাত তার মৃত শত্রুর পাশে নিশ্চল শুয়ে শুয়ে ধুঁকল। এরপর সাতদিন কেবল জল খাবার সময় ছাড়া গুহা থেকে বারই হোলো না। যখনই একটু একটু হাঁটা-চলা করে যন্ত্রণায় নুয়ে নুয়ে পড়ে। সপ্তাহব্যাপী বিশ্রামের মধ্যে মায়ে-পোয়ে মিলে মিশে বনবিড়ালটাকে দিয়ে পেট ভরাল। তারপর আবার সুরু হোলো শিকারী জীবন।

বাচ্চাটা এরও পরে বেশ কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল, ব্যথায় শক্ত হয়ে রইল কাঁধটা। কিন্তু তার চোখের সামনেকার পৃথিবীটা যেন বদলে গেছে। এই পৃথিবী মাড়িয়ে সে বলিষ্ঠতর আত্মবিশ্বাসে এখন থেকে ঘুরে বেড়াবে, বুকে তার নতুন বল। জীবনের মহা নৃশংস রূপের সামনা-সামনি সে হয়েছে, শত্রুর গায়ে দাঁত বসিয়ে লড়াই করেছে আমরণ, কিন্তু মরেনি। তার মনে এসেছে নতুন দুঃসাহস, চলাফেরায় নতুন গর্বোদ্ধত ভঙ্গি।

এবার থেকে শিকারের সন্ধানে সে মার সঙ্গে সঙ্গে বার হতে লাগল;—হতে লাগল শিকারের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তার ছোট্ট মাথায় শিকারের কানুনগুলো আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগল। সে বুঝল প্রাণী দু-দলের। একদলে সে আর তার মা, অন্যদলে বনের আর সবাই। অন্যদলের আবার দুভাগ,—একভাগের প্রাণীগুলো

ছোটছোট, সহজ শিকারের খোরাক। অন্য ভাগে আছে বড়ো বড়ো প্রাণী,—যারা উল্টে তাকে শিকার করে খেয়ে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের প্রাণীগুলো সম্বন্ধে সাবধান। কেন না জীবনের উদ্দেশ্যই তো শিকার,—মাংস মারা আর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করা। দুনিয়ায় একটিমাত্র সম্বন্ধ, খাদ্য আর খাদকের। হয় খাদক হও নয় খাদ্য হতে হবে।

এই সম্বন্ধ নিয়ে আর এই কানুন মেনেই সারা দুনিয়া চলছে। পাখির বাচ্চাদের সে খেয়েছিল। মা-পাখিটাকে খেল বাজপাখি। তাকেও প্রায় খেয়েছিল আর কি! আবার যখন বেশ কিছুটা বড়ো সে হোলো, তখন সেই বাজপাখিকে খেতেই তার সাধ জাগল। বনবিড়ালের বাচ্চাগুলো সে খেয়েছিল আর তাকে খেতে এসেছিল মা-বনবিড়াল। খেয়েই ফেলত, যদি না সে আর তার মা লড়াই করে সেটাকে মারত। শেষ পর্যন্ত বনবিড়াল গেল তাদেরই পেটে। এই তো নীতি। মাংসের শিকার তার চারদিকে—কেউ পালায়, হয় আকাশে ওড়ে বা গাছে চড়ে বা গর্তে লুকোয়। কেউ বা উল্টে তার সঙ্গে লড়াই করতে আসে, তাড়া করে তাকেই

বিস্ময় আছে খুসি আছে, আছে পরম আরাম। শিকার মেরে ভর্তি-পেট খেয়ে পরম আলস্যে রোদে পিঠ দিয়ে ঢোলবার মতো আরাম আর কিছু আছে নাকি? সেই তো প্রতি মুহূর্তের পরিশ্রমের আর প্রাণান্তকর শিকারের পরম পুরস্কার।

আনন্দে উত্তেজনায় সাহসে আরামে আলস্যে বেড়ে উঠতে লাগল বাচ্চাটা।

আগুনে যাদের অধিকার

হঠাৎ একেবারে সামনাসামনি গিয়ে পড়ল বাচ্চাটা। তার নিজেরই দোষ। ঘুম চোখে গুহা থেকে বার হয়ে এক দৌড়ে সে ছুটেছিল ঝরণায় জল খেতে। লক্ষ্য করেনি কিছু, ছুটেছিল অসাবধানে। এ পথে কতোবার সে তৃষ্ণা মেটাতে এমনিভাবে দৌড়েছে, কখনো তো কিছু ঘটেনি।

পোড়া পাইনের কোল ঘেঁসে এগিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে সে গাছপালার মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল তার চোখ আর নাক। তার ঠিক সামনেই উবু হয়ে বসে আছে পাঁচটা অদ্ভুত অচেনা প্রাণী, এদের চেহারা কখনো সে দেখেনি আগে। বাচ্চাটার চোখ প্রথম দেখল মানুষ। তাকে দেখে মানুষ পাঁচটা কিন্তু লাফিয়ে উঠল না। দাঁত বার করে গর্জনও করল না অন্য জন্তুদের মতো। অদ্ভুত রকমের ভয় দেখানো নিশ্চল মূর্তিতে বসেই রইল যেমন ছিল।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাচ্চাটাও। তার সারা প্রকৃতির প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে সে চাইছে প্রাণপণে পলায়ন করতে, আবার তার মনে কেমন অজানা একটা তীক্ষ্ণতর অনুভূতির উদয় হয়ে তাকে আটকেও রেখেছে। তার সারা অন্তর ভরে উঠেছে এক অনির্বচনীয় শ্রদ্ধা-মেশানো ভয়ে। নিজে সে কতো ক্ষুদ্র কতো অসহায়—এই নবলব্ধ অনুভূতি তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চকিতে আচ্ছন্ন করে ফেলল, পা তার নড়ল না। ওরা কারা তার সামনে? ওরাই নাকি প্রভু,—সকল শক্তির প্রতীক, সকল বিস্ময়ের মূল!

বাচ্চাটা আগে কখনো মানুষ দেখেনি;—কিন্তু তার রক্তে কোথা থেকে বাসা বেঁধেছিল মানুষ চেনার অনুভূতি। এই তো সেই প্রাণী

যে বন্য-জগতের সব প্রাণীকে হারিয়ে প্রাণীজগতের রাজা হয়ে বসেছে। এই সে আশ্চর্য দু-পেয়ে জন্তু, যা সব জন্তুর সর্বেশ্বর। সারা প্রাণী-জগতের যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতা, ভয় আর শ্রদ্ধা নিয়ে বাচ্চাটা দেখতে লাগল মানুষ-গুলোকে। বুদ্ধিমান বড়ো নেকড়ে হলে হয়তো পালাত। বাচ্চা বলেই বুঝি সে আতংকে একেবারে স্থাণু হয়ে গেল। সারা নেকড়ে জাতের প্রথম যে নেকড়ে মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মানুষের তাঁবুর আগুনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই আদিকালের হীন বশ্যতার ভারে নুয়ে পড়ল বাচ্চাটার ছোট্ট দেহ।

মানুষগুলো রেড-ইণ্ডিয়ান। ওদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। এবার আর নিস্তার নেই। সবচেয়ে অজানা তার দিকে হাত বাড়িয়েছে। আপন স্বভাবের বশে তার পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল, কুঁকড়ে গেল ঠোঁট দুটো, বার হয় এল দাঁত। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল,—আরে গ্যাখ গ্যাখ, কি রকম সাদা দেঁতো!

অন্য ইণ্ডিয়ানগুলো হাসতে লাগল, বললে,—ধর্ না ওটাকে। পিঠের ওপর হাত পড়তেই বাচ্চাটা ভাবল, লড়তেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁত বসিয়ে দিল হাতে। পরমুহূর্তেই মাথার এক ধারে বিরাট একটা ঘুসি। লড়াইএর সাহস আর তার এক ফোঁটাও রইল না, কেঁউ কেঁউ সুরু করল। শাস্তি কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। মাথার আর একধারে আর এক ঘুসি পড়ল। একেবারে গড়িয়ে পড়ল সে। কোনোরকমে উঠে বসে আরো জোরে সে জুড়ে দিল কান্না।

ইণ্ডিয়ানগুলো হাসতে লাগল সশব্দে;—এমন কি যে লোকটা কামড় খেয়েছিল সেও। ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল তারা সবাই। কান্নার মধ্যে হঠাৎ বাচ্চাটার কানে এল পরিচিত একটা শব্দ। ইণ্ডিয়ানরাও সে শব্দ শুনল। বুকফাটা সুদীর্ঘ একটিমাত্র আর্তধ্বনি তুলে বাচ্চাটা চুপ করে প্রতীক্ষা করতে

লাগল। আর কান্না; নয়, আর ভয় নেই; আসছে তার মা, নির্ভীক অপরাজেয় ক্ষমতা নিয়ে। বাচ্চাটার কান্না ঠিক মা-নেকড়ের কাছে গিয়েছিল,—সে গর্জন করতে করতে তীরবেগে ছুটে আসছে।

এক লাফে মানুষগুলোর মাঝখানে এসে পড়ল মাদী নেকড়েটা! উন্মাদ তার চেহারা, হিংস্র বিকট তার গর্জন। বাচ্চাটাও এক লাফে মার পাশে এসে দাঁড়াল, মানুষগুলো হটে গেল পিছন দিকে। বাচ্চাটাকে আড়াল করে মাদী নেকড়েটা দাঁড়াল মানুষগুলোর মুখোমুখি। চোখে তার আগুন জ্বলছে, ক্রোধে আক্রোশে তার মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে, ঠোঁটগুলো সরে গিয়ে শাণিত দাঁতের দুপাটি ঝক ঝক করে উঠেছে, গলার মধ্যে থেকে বার হচ্ছে ভয়ংকর গোঁ গোঁ আওয়াজ।

হঠাৎ একটা মানুষ চিৎকার করে উঠল একটি মাত্র কথা,—কিচে! বিস্ময়ভরা চিৎকার, কিন্তু বাচ্চাটার মনে হোলো, শব্দটা যেন একটা মন্ত্র, যার বলে তার মা-র সব বিক্রম লোপ পাচ্ছে।

লোকটা আবার ডাকল, এবার জোর হুকুমের গলায়,—কিচে! বাচ্চাটা অবাক হয়ে দেখল, তার মা,—তার সর্বজয়া মা, জঙ্গলের সর্বভয়-হারা মাদী নেকড়ে আস্তে আস্তে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে নিচু হয়ে লুটিয়ে পড়েছে, লেজ নাড়ছে, কেঁউ কেঁউ করে সন্ধিভিক্ষা করছে।

লোকটা মাদী নেকড়ের কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখল। নেকড়েটা লাফাল না, কামড়াতে গেল না, আরো গুঁড়িসুড়ি হয়ে গেল। আর-সব মানুষগুলো তখন মাদী-নেকড়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কেউ তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল, কেউ পিঠে মারতে লাগল চাপড়। উত্তেজনায় লোকগুলো মুখ দিয়ে বক বক আওয়াজ করছে। মাদী নেকড়ে একেবারে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। বাচ্চাটা মা-র কোলে আশ্রয় খুঁজল। তবু বিস্ময়ে আর রাগে তার গায়ের লোম মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে উঠতে লাগল।

একজন ইণ্ডিয়ান বললে,—এ আর এমন আশ্চর্য কী? মা ছিল কুকুর, কিন্তু বাপ ছিল নেকড়ে।

আর একজন বললে,—ঠিক এক বছর আগে এটাই পালি। তাই না গ্রে বিভার?

গ্রে বিভার উত্তর দিল,—মনে আছে সামন টং, কী দুর্ভিক্ষ তখন?

তৃতীয় আর একজন বললে,—খেতে না পেয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল। ছিল নেকড়েদের দলে।

গ্রে বিভার বাচ্চাটার পিঠে হাত দিয়ে বললে,—ঠিক বলেছ থ্রি ঈগল্‌স্‌, এই তো তার প্রমাণ।

গায়ে হাত পড়তেই দাঁত বার করে ফোঁস করে উঠল বাচ্চাটা। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর উদ্যত ঘুসি দেখেই সে মাথা নিচু করে লুটিয়ে পড়ল,—গ্রে বিভার আস্তে আস্তে তার কান চুলকিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

গ্রে বিভার বললে,—ছাখো! কিচেটা আবার ফিরে এল। বাচ্চাটার বাপও নেকড়ে। ওটার মধ্যে নেকড়ের ভাগ পুরোপুরি, কুকুরের ভাগ নেই বললেই চলে। কিচে ছিল আমার ভাই-এর কুকুর। ভাই আমার মরেছে। এখন কিচে আর তার বাচ্চা আমারই হোলো। ঠিক তো?

কেউ আপত্তি করল না। গ্রে বিভার আবার বললে,—বাচ্চাটার দাঁতগুলো দেখেছ কেমন সাদা চকচকে? এটার আমি নাম দিলাম হোয়াইট ফ্যাঙ।

নামকরণ হোলো বাচ্চাটার। সে মা-র পাশে কুঁকড়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করে লক্ষ্য করতে লাগল মানুষদের কার্যকলাপ, কান খাড়া করে শুনতে লাগল তাদের বকবকানি। একটু পরে গ্রে বিভার গলায় ঝোলানো খাপ থেকে ধারালো একটা ছোরা বার করে জঙ্গল থেকে একটা লাঠি কেটে নিয়ে এল। লাঠিটার দুধারে দুটো গাঁট কেটে সেই গাঁটদুটোর

সঙ্গে শক্ত কাঁচা চামড়ায় ছুটো মোটা দড়ি বাঁধল সে। . একদিকের দড়িটা সে কিচের গলায় বাঁধল। তারপর তাকে একটা ছোট পাইন গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে অপর দিকের দড়িটা বেঁধে দিল গাছের গুড়িতে। মা-র পাশে গিয়ে শুল হোয়াইট ফ্যাঙ। সামন টং তার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে চিৎ করে ফেলল। কিচে সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে লাগল ব্যাপারটা। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। দাঁত বার করার সাহসটুকুও তার রইল না। মানুষের হাতটা তাকে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ফেলতে লাগল আর খালি সুড়সুড়ি দিতে লাগল তার পেটে। নিতান্ত নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থায় চার পা আকাশে তুলে ছটফট করতে লাগল বাচ্চাটা।

পালাবার তার উপায় নেই, মানুষটা যদি তাকে মারে তবু কিছু নেই করার। আস্তে আস্তে ভয় তার কমে এল। আর মজা এই যে কোথা থেকে অবিশ্বাস্য অপরিচিত একটা আরামে আর সুখে তার মন ভরে উঠতে লাগল। মানুষের হাতের আদরের আরামটা কী, তা এই প্রথম টের পেল বাচ্চাটা। ক্ষণে ক্ষণে সে শিউরে উঠতে লাগল,—এ কী মধুর পুলক-শিহরণ! সারা গায়ে বেশ কিছুক্ষণ আদর করার পর লোকটা তাকে ছেড়ে দিল। এর মধ্যে বাচ্চাটার সমস্ত ভয় কেটে গেছে। সে উপলব্ধি করছে, মানুষ ভয়াল, কিন্তু মানুষ বন্ধুও। অচেনা মানুষের সঙ্গে নিবিড় থেকে নিবিড়তর বন্ধুত্বের পথেই এবার থেকে তার জীবন এগিয়ে চলবে।

কিছুক্ষণ পরে হোয়াইট ফ্যাঙ শুনল দূর থেকে নানারকমের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। কান তার তৈরি হয়েছে, সে বুঝল আওয়াজগুলো মানুষের গলার। ইণ্ডিয়ানদের দলের বাকি মানুষগুলো সার বেঁধে এসে পৌঁছল। এক গাদা মেয়ে পুরুষ আর শিশু, মাথায় পিঠে মালপত্র, তাঁবুর সরঞ্জাম। সঙ্গে একপাল কুকুর আর কুকুর বাচ্চা।

কুকুরগুলোর পিঠেও বোঝা বাঁধা, পেটের তলায় ঝোলানো ভারি ভারি বাণ্ডিল।

হোয়াইট ফ্যাঙ আগে কখনো কুকুর দেখেনি। দেখেই সে বুঝল ওগুলো তারই জাতের, তবে একটু যেন অন্য রকমের। মেজাজ কিন্তু তাদের নেকড়েরই মতো হিংস্র। হোয়াইট ফ্যাঙ আর তার মাকে দেখেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে লোম খাড়া করে দাঁত বাগিয়ে লড়াই সুরু করল হোয়াইট ফ্যাঙ, কুকুরের পাল এক লহমায় তার ওপর পড়ে তার বুকে বসে আঁচড়ে কামড়ে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিল। কুকুরদের চিৎকারের মধ্যে তার কানে এল কিচের গর্জন। বন্দী অবস্থাতেও সে সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ লড়ছে। তারপর মানুষের দলের ধমক, লাঠির দমাদম শব্দ আর মার-খাওয়া পলায়মান কুকুরগুলোর আর্তনাদ।

কোনো রকমে খাড়া হয়ে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে মানুষ। লাঠি মেরে পাথর ছুঁড়ে মানুষগুলো কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ একটা আশ্চর্য প্রাণী। তারা অন্যায়কে সমর্থন করে না, অন্যায়ের হাত থেকে দুর্বলকে তারা বাঁচায়। আইন তারা গড়ে, আইন তারা খাটায়। আর কী অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের! তারা আঁচড়ায় না, কামড়ায় না। তাদের বিধানে নিষ্প্রাণ জিনিষ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। লাঠি, পাথর তাদের হাতের জোরে, তাদের হুকুমে অস্ত্র হয়ে ওঠে। অবাধ্য কুকুরদের তারা সায়েস্তা করে দেয়। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য!

কুকুরের দল সব পালিয়েছে। ঠাণ্ডা হয়েছে গোলমাল। বসে বসে ঘা চাটতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ,—আর ভাবতে লাগল। ছাখো, কুকুরগুলো তো তারই দলের, তার নিজেরই জাতের; তবু কী নিষ্ঠুর! দল সে আগে দেখেনি, দল বলতে বুঝত সে নিজে আর তার বাবা মা।

এবার বুঝল দল কী, দলের হিংসা কেমন নির্মম। দুঃখে রাগে বিষিয়ে উঠল তার মন। রাগ হোলো মানুষগুলোর ওপরেও, যারা তার মাকে লাঠি আর চামড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বন্দীদশা কি সয়? অথচ প্রতিবাদ করার উপায় নেই। যারা বেঁধেছে তারা যে প্রাণীর রাজা—মানুষ!

মানুষের দল সুরু করল যাত্রা। একটা মানুষ লাঠির আগাটা ধরে কিচেকে সঙ্গে নিয়ে চলল। বিমর্ষ মনে পিছনে পিছনে অনুসরণ করল বাচ্চা হোয়াইট ফ্যাঙ। জানে না কোথায় এই অনির্দিষ্ট যাত্রার শেষ। তবু যেতেই হবে ওদের সঙ্গে। ভালো না লাগলেও।

বন ছাড়িয়ে ঝরণার তীর বেয়ে উপত্যকার ওপর দিয়ে অবিরাম চলতে লাগল মানুষের দল। ক্রমে উপত্যকা শেষ হোলো, ঝরণা এসে মিশল ম্যাকেঞ্জি নদীতে। এখানে চড়ার ওপর পোতা উঁচু উঁচু খুঁটিতে টাঙানো রয়েছে মাছ-ধরা নৌকো মাছ-ধরা জাল আর মাছ শুকানোর পাটাতন। মানুষের দল নদীর তীরে তাঁবু খাটাল; হাঁ হয়ে দেখতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ্। বড়ো বড়ো খুঁটি তারা খাড়া করে দাঁড় করালো, তারপর খুঁটির সঙ্গে কাপড় আর চামড়া খাটিয়ে তারা বানালো ঘর। সারা নদীতীরের চেহারাটাই বদলে গেল। চারদিকে একের পর এক বড়ো বড়ো ঘর জেগে উঠতে লাগল মানুষের হাতের গুণে। কী ভয়ংকর আকাশ-ছোঁয়া ওগুলোর চেহারা! হাওয়ায় ওরা দোলে, কেমন অদ্ভুত শোঁ শোঁ শব্দ বার হয়,—ভেঙে পড়বে না কি মাথার ওপর?

আস্তে আস্তে তাঁবুর ভয় কাটল হোয়াইট ফ্যাঙ্এর। সে দেখল মেয়েরা শিশুরা নির্ভয়ে ওগুলোর মধ্যে যাওয়া আসা করছে, দু একটা কুকুরও ঢোকবার সুযোগ খুঁজছে। তবে আর তার ভয় কী? মা-র পাশ

ছেড়ে সে এগোলো। পায়ে পায়ে পায়ে একটা তাঁবুর ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে। ঔৎসুক্য বাড়ল। কয়েকবার শুঁকে সে তাঁবুর কাপড়ের একটা কোণ কামড়ে টানাটানি সুরু করে দিল। দুলতে লাগল তাঁবুটা। ভারি মজা লাগল বাচ্চাটার। আরো জোরে টানে, তাঁবু দোলে আরো বেশি করে। হঠাৎ তাঁবুর ভিতর থেকে একজন স্ত্রীলোক ধমক দিয়ে উঠল। হোয়াইট ফ্যাঙ এক দৌড়ে পালাল মা-র কাছে।

একটু পরে মা-র আওতা ছেড়ে আবার সে এগোলো। কিচের গলার লাঠিটা মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, সন্তানকে অনুসরণ করবার তার উপায় নেই। হোয়াইট ফ্যাঙের সামনে এসে দাঁড়াল একটা বাড়ন্ত কুকুরছানা। এটা তার চাইতে বয়সে বড়ো, চেহারাতেও। জবরদস্ত এর মেজাজ, নিষ্ঠুর কুচক্রী মন। সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে অনেক লড়াইএর অভিজ্ঞতা এটার এর মধ্যেই হয়েছে। নাম লিপ-লিপ।

হাজার হোক কুকুরবাচ্চা তো? তারই মতন, তারই সমবয়সী। একে ভয় কী? হোয়াইট ফ্যাঙও দাঁড়াল শক্ত হয়ে, তার সাদা সাদা দাঁতের পাটি ঝক ঝক করে উঠল। চাপা গর্ গর্ শব্দ করতে করতে কয়েকবার এ-ওকে প্রদক্ষিণ করল। হোয়াইট ফ্যাঙ ভাবল, এ বুঝি একটা খেলা। তারপর হঠাৎ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লিপ-লিপ লাফিয়ে উঠল, দাঁতের একটা প্রচণ্ড কামড় বসিয়েই এক ঝটকায় সরে গেল নাগালের বাইরে। মাদী বেড়ালের সঙ্গে লড়াইয়ে ঘা খাওয়া কাঁধটার ওপরে ঠিক কামড়টা পড়ল। ককিয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ—এমনিতেই তো কাঁধটায় হাড় পর্যন্ত টনটনে ব্যথা। পর মুহূর্তেই যন্ত্রণা আর রাগের বেগে সে লাফিয়ে পড়ল শত্রুর ওপর।

লিপ-লিপ কিন্তু মানুষের দলে মানুষ হয়েছে, দলের কুকুরবাচ্চাদের সঙ্গে এমনি লড়াই অনেক সে করেছে। বাচ্চা হোয়াইট ফ্যাঙ তার সঙ্গে

পারবে কেন? কামড়ে কামড়ে লিপ-লিপ তার সারা গা ক্ষতবিক্ষত করে দিল। কাতর আর্তনাদ করতে করতে সে শেষ পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে পালাল মা-র আশ্রয়ে। এই হোলো লিপ-লিপের সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙের প্রথম লড়াই। এই যে শত্রুতার আরম্ভ হোলো তা সারা জীবনে ঘোচেনি। এই লড়াইএর হয়েছে বহু পুনরাবৃত্তি।

বাচ্চার সারা অঙ্গ চেটে চেটে কিচে ব্যথা জুড়িয়ে দিল, চেষ্টা করল তাকে নিজের কাছে বসিয়ে রাখতে। কিন্তু বাচ্চা কি শোনে? তার কৌতূহলের যে শেষ নেই! আবার সে গুটি গুটি এগোলো। এবার তার সামনে পড়ল তার মানুষ প্রভু। মাটিতে বসে সামনে শুকনো কাঠ আর খড়-পাতা নিয়ে গ্রে বিভার কী যেন করছিল,—হোয়াইট ফ্যাঙকে দেখে ডাক দিল। বাচ্চাটার মনে হোলো মানুষটার বক্-বকানিতে রাগের ধমক নেই। সাহস করে তাই সে আরো কিছুটা এগিয়ে গেল।

কতকগুলো স্ত্রীলোক আর শিশু আরো অনেক কাঠ আর গাছের ডাল এনে গ্রে বিভারের কাছে জড়ো করল। হোয়াইট ফ্যাঙ ঔৎসুক্য-ভরে এগোতে এগোতে একেবারে গ্রে বিভারের হাঁটুর কাছে এসে পৌছলো। হঠাৎ চমকে উঠল সে। অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে সে দেখল, গ্রে বিভারের হাতের স্পর্শে কী একটা জিনিষ ঐ কাঠ আর ডালপালার মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠছে। জিনিষটার প্রাণ আছে, বড়ো হচ্ছে, লাফালাফি করছে, উঁচু হয়ে উঠছে,—আকাশের সূর্যের রঙের একটা জিভ যেন একসঙ্গে অনেকগুলো হয়ে লক্‌লক্ করে নাচছে। আগুন কি, তা এতদিন হোয়াইট ফ্যাঙ জানত না। সূর্যের আলো একদা যেমন তাকে বন্ধ গুহা থেকে আকর্ষণ করে বাইরের পৃথিবীতে টেনে এনেছিল, ঠিক তেমনি আকর্ষণে আগুন তাকে কাছে টানল। সে শুনল মাথার ওপরে গ্রে বিভারের হাসির আওয়াজ। মানুষের হাসিতে

যে ভয় নেই, সে. উপলব্ধি তার হয়েছে। নির্ভীক আগ্রহে সে নাক দিয়ে স্পর্শ করল, জিভ বার করে চাটল অগ্নিশিখা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো, যন্ত্রণার চকিত শিহরণে তার সর্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে গেছে। কাঠ পাতার মাঝখান থেকে মানুষ-দেবতার হাতের গুণে জন্ম নিয়ে লাল টকটকে কী ভয়ংকর অজানা একটা রাক্ষস নাক-শুদ্ধ তাকে টেনে ধরেছে। হামাগুড়ি দিয়ে সে পিছিয়ে এল, চারদিক মুখর হয়ে উঠল তার কাৎরানিতে। সে কান্না শুনে গর্জন করে উঠল কিচে, সন্তানের কাছে আসবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল বাঁধন ছিঁড়তে। গ্রে বিভার কিন্তু হাঁটু চাপড়ে হো হো করে হেসে উঠল, আর সবাইকে ডেকে সে দেখাল বাচ্চাটার দুর্দশা। হাসির দমকে যেন ফেটে পড়তে লাগল মানুষের দল। তাদের মাঝখানে একলা বসে হোয়াইট ফ্যাঙ কিঁউ কিঁউ করতে লাগল, হাসির আওয়াজে ডুবে গেল তার কান্না।

এমনি ভীষণ ব্যথা আগে কখনো পায়নি হোয়াইট ফ্যাঙ। পোড়া নাকটাকে জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা করল, কিন্তু জিভটাও যে ঝলসে গেছে! নাকের যন্ত্রণা আর জিভের যন্ত্রণা এক হয়ে গেছে,—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? তাই নিরুপায় কান্না ছাড়া তার গতি নেই।

তাছাড়া লজ্জাও কি কম? তাকে গোল হয়ে ঘিরে হাসছে মানুষের দল। মানুষের হাসি সে চেনে, বুঝেছে হাসির মানে। পোড়ার বেদনায় মুখ যতো না কালি হোক, ঐ হাসির লজ্জায় সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, কালো হয়ে গেল তার মন। অধোবদনে পালাল মা-র কাছে। একমাত্র মা জননীই তার দুঃখে কখনো ঠাট্টার হাসি হাসবে না।

গোধূলি নেমে এল, ঘনিয়ে এল অন্ধকার। মা-র পাশ ঘেঁষে শুল হোয়াইট ফ্যাঙ। নাক আর জিভের যন্ত্রণা এখনো যায় নি, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো হয়ে বাজছে কেমন একটা মন-কেমন-করা বেদনা। মন

চাইছে,—ঘরে চলো, ফিরে চলো সেই অরণ্যে, যেখানে পাহাড়ের তলায় রয়েছে তার নিশ্চিন্ত গুহাটি, যেখানে কুলু কুলু বয়ে চলেছে তার মধুর ঝরণাটি। এখানে বড়ো ভিড়, অসহ্য কোলাহল। মেয়ে পুরুষ আর শিশু মিলে এক পাল মানুষের বকবকানি আর সেইসঙ্গে এক ঝাঁক কুকুরের দৌড়ঝাঁপ, মারামারি আর চিৎকার। কোথায় গেল সেই নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ শান্তির নীড়? এখানে সদা সর্বদা প্রাণীর চলা ফেরা, বিরামহীন শব্দের ওঠা-পড়া;—মন এখানে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে, অবসর পায় না,—মুহূর্তে মুহূর্তে সজাগ বিস্ময়ে ভাবে,—কী হোলো, এই আবার বুঝি কী হোলো!

ভাবতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল মানুষ-প্রাণীদের কার্যকলাপ। ওরা জাদু জানে, ওরা কতো বিচিত্র নতুন নতুন ক্ষমতার অধিকারী, সব অজানা বিস্ময়ের ওরা প্রতীক! নিষ্প্রাণকে ওরা কাজে লাগায়, হাতের গুণে কাঠের কন্দর থেকে রক্তাক্ত উত্তপ্ত প্রাণশিখার ওরা জন্ম দেয়। ওরা আগুন জ্বালে,—ওরা দেবতা!

দেবতার একটি মাত্র ডাক, একবার মাত্র আহ্বান। দ্বিরুক্তি করেনি কিচে, আত্মসমর্পণ করেছিল দেবতার পায়ে, বশ্যতা স্বীকার করেছিল এক মুহূর্তে। তার বাচ্চা হোয়াইট ফ্যাঙও শিখছে মানুষ-দেবতার পায়ে আত্মনিবেদন করতে। দেবতারা যে পথে হাঁটে, সে পথ থেকে সরে দাঁড়ায় সে, দেবতারা যখন ডাকে, ন্যাজ নেড়ে ছুটে যায় তাদের কাছে। তারা ধমকালে সে চমকায়, হুকুম করলে তামিল করে। দেবতারা যে আসল ক্ষমতার অধিকারী,—আঘাত করবার ক্ষমতা, ইঁট আর লাঠি পাথর আর চাবুক এ সব মরা জিনিষকে প্রাণবন্ত করে মোক্ষম আঘাত হানবার ক্ষমতা তাদের।

দলের সব কটা কুকুরের মালিক ঐ দেবতারা,—তারও মালিক। তাকে মারতে তারা, রাখতেও। তারাই সব। এই শিক্ষাই হোয়াইট ফ্যাঙ ধীরে ধীরে পাচ্ছে। মেজাজ তার বন্য,—স্বাধীন; মন বিদ্রোহ করে এ শিক্ষার বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজেরই অজান্তে আস্তে আস্তে সে শেখে। তার দেহ-প্রাণ সে সমর্পণ করছে অপরের হাতে। চুপি চুপি মন বলে,—মন্দ কী? নিজের ভার নিজেকে একলা বইতে তো হবে না!

এক দিনেই বন্দীত্বের এ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। রক্তে তার আদিম বন্যতা, তার মন জোড়া অরণ্য। কতো দিন সে একলা একলা লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে কে যেন কতো দূর থেকে তাকে ডাকছে। কিন্তু পালাতে সে পারে না. প্রতিবারই মনের ভার মনে চেপে রেখে মা-র কাছে ফিরে আসে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, প্রশ্নভরা আগ্রহে জিভ দিয়ে মা-র মুখ চাটে।

তাঁবুর জীবনযাত্রায় ক্রমে তার অভ্যাস হচ্ছে। বড়ো বড়ো কুকুরের খাবারের লোভ আর স্বার্থপরতা সে চিনেছে। জেনেছে, যে সব মাদী কুকুরের কোলে ছানা তাদের কাছে এগোনো সবচেয়ে বিপদজনক। আর মানুষের বেলায় সে বুঝেছে, ওদের পুরুষগুলো অন্যায়ের ভক্ত নয়, শিশুরা নিষ্ঠুর আর মেয়েগুলোর প্রাণে বেশ দয়ামায়া আছে। দু'-একটুকরো অতিরিক্ত মাংস সাধারণত মেয়েদের হাত থেকেই তার জোটে।

লিপ-লিপ কিন্তু তার জীবনের কাঁটা। বয়সে চেহারাতে শক্তিতে হোয়াইট ফ্যাঙএর চেয়ে সে অনেক বড়ো, হোয়াইট ফ্যাঙকে অত্যাচার করাই তার প্রধান আনন্দ। ফ্যাঙ লড়ে, কিন্তু জিততে পারে না একবারও! মা-র কাছ ছেড়ে এক পা সে এগিয়েছে, অমনি দেখে কোথা থেকে দুঃস্বপ্নের মতো লিপ-লিপ তার সামনে। সব সময় সে তার পেছনে লেগেই আছে। মানুষ-জন কাছে না থাকলেই সে তেড়ে আসে। লড়াইতে লিপ-লিপ সমানে জেতে, ক্ষতবিক্ষত করে দেয় হোয়াইট ফ্যাঙকে। একজনের কাছে যা খেলা অপরের পক্ষে তা চিরন্তন বিভীষিকা।

দমে না ফ্যাঙ। মার খায়, মন কিন্তু হার স্বীকার করে না। তবে নিষ্ঠুরতা সহ্য করে করে দিনে দিনে তার মেজাজ রুক্ষ আর কোপন হয়ে ওঠে। জন্ম থেকেই সে ছিল বন্য, অত্যাচারে দিনে দিনে বন্যতা তার আরো বাড়ে, হাসিখুসি খেলাধুলো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তার মধ্যে বিকাশের সুযোগ পায় না। যদি বা অন্য কুকুর-বাচ্চাদের সঙ্গে সে কখনো খেলতে যায়, অমনি তেড়ে আসে লিপ-লিপ। ধমকে চেঁচিয়ে মেরে তাকে দূরে ভাগিয়ে দেয়।

তাই অল্প বয়স থেকেই বুড়ো নেকড়ের মতো কুচক্রী হয়ে ওঠে হোয়াইট ফ্যাঙ। শয়তানী মতলব বাসা বাঁধে একে একে। অন্য সব

কুকুরের মতো খাদ্যের সমান ভাগ নিতে সে বাধা পায়, ফলে ক্রমে সে হয়ে ওঠে পাকা চোর। তাঁবুর মধ্যে চুরি করতে ঢুকে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকদের হাতে সে মার খায়;—প্রহার এড়িয়ে কাজ হাঁসিল করার নতুন নতুন কুটিল মতলব সে ভাঁজে।

লিপ-লিপের ওপর প্রতিহিংসা অবশেষে একদিন তার মিটল। নেকড়ে-জীবনে কিচে যেমন মানুষের আশ্রয় থেকে পোষা কুকুরদের ধ্বংসের পথে ভুলিয়ে নিয়ে যেত, হোয়াইট ফ্যাঙও একদিন অনেকটা তেমনি করে লিপ-লিপকে টেনে আনল তার মা-র কামড়ের আওতায়। সেদিনকার লড়াইতে সে লিপ-লিপের হাত থেকে পালাবার ছল করে তাঁবুগুলোর এধারে ওধারে দৌড়ে বেড়াতে লাগল। দৌড়ে লিপ-লিপ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। লিপ-লিপ ছুটতে লাগল পিছনে পিছনে, হোয়াইট ফ্যাঙ দৌড়ল ঠিক এক পা আগে আগে।

জয়োল্লাসে ছুটতে ছুটতে লিপ-লিপের খেয়াল রইল না কোথায় সে চলেছে। যখন তার সম্বিত ফিরল, তখন আর উপায় নেই। একটা তাঁবুর পাশ দিয়ে প্রচণ্ডবেগে ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে পড়ল একেবারে লাঠিতে বাঁধা কিচের ঘাড়ের ওপর। ভয়ে আর্তনাদ করার সময় সে পেল না, আটকে গেল কিচের দাঁতের কামড়ে। কিচে তাকে পালাতে দিল না, মাটিতে চিৎ করে ফেলল, নির্মম প্রতিহিংসায় তাকে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়তে লাগল।

সারা গায়ে যখন আর ক্ষতের শেষ নেই, তখন কোনোরকমে সে গড়াতে গড়াতে কিচের আওতার বাইরে গিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল। কোনো রকমে চার পা খাড়া করে দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদবার জন্যে যেই সে হাঁ করেছে, অমনি ছুটে এল বাচ্চা হোয়াইট ফ্যাঙ, দাঁত বসিয়ে দিল তার পিছনের পায়ে। লিপ-লিপের সব দম্ভ ঘুচল। সে

দৌড়ল প্রাণভয়ে, তাকে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে উদ্যত্ত করতে করতে সঙ্গে ছুটল হোয়াইট ফ্যাঙ। খুসির উত্তেজনায় সে তখন ফেটে পড়ছে। কয়েকটা স্ত্রীলোক এসে শেষ পর্যন্ত হোয়াইট ফ্যাঙকে রুখল, রক্ষা পেল লিপ-লিপ।

কদিন পরে মুক্তি পেল কিচে। গ্রে বিভার বুঝল আর সে পালাবে না. কিচের গলার বাঁধন সে খসিয়ে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙের আনন্দ দেখে কে? সে এবার থেকে মা-র সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা সব জায়গায় ঘোরে, আর দূর থেকে লিপ-লিপকে দাঁত বার করে ভয় দেখায়। লিপ-লিপ বোকা নয়, সে ওদের কাছেও ঘেঁসে না, প্রতীক্ষা করে কবে বাচ্চাটাকে একা পাবে।

সেদিন বিকেলে কিচে আর হোয়াইট ফ্যাঙ বসতির প্রান্তে জঙ্গলের ধার পর্যন্ত গেল। হোয়াইট ফ্যাঙই এক পা এক পা করে এগিয়ে মাকে টেনে নিয়ে গেল। জঙ্গলের কিনার পর্যন্ত গিয়ে মা চুপ করে দাঁড়াল। বাচ্চা কিন্তু চুপ করার পাত্র নয়। সেই গুহা সেই ঝরণা, অরণ্যের নিবিড় স্তব্ধতা তাকে ডাকছে। গাছপালার মধ্যে বারে বারে লাফিয়ে লাফিয়ে সে যেতে লাগল, আবার ফিরে এসে কিউ কিঁউ করে ডাকতে লাগল মাকে, মা-র মুখ চেটে আদর করে আবার দৌড়ে যেতে লাগল সামনে। মা কিন্তু এক পাও এগোলো না। তার সমস্ত আগ্রহ, সব আহ্বান ব্যর্থ হয়ে গেল, কিচে মুখ ফিরিয়ে তাকাল জনবসতির দিকে।

মুক্তির আহ্বান কিচের কানে এসেও পৌঁছেছিল। কিন্তু সেই আহ্বানকে ছাপিয়ে তার কানে বাজল মানুষের ডাক,—সভ্য জগতের নিরুদ্বেগ জীবনের ডাক। কিচে পিছন ফিরে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। মানুষ-দেবতারা অদৃশ্য জালে তাকে বেঁধেছে, নিঃশব্দ মন্ত্রে তাকে বশ করেছে, তাদের ছেড়ে যাবার তার উপায় নেই। হোয়াইট ফ্যাঙ একটা বার্চ গাছের ছায়ায় বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পাইন গাছের উগ্র গন্ধের সঙ্গে

বনভূমির সমস্ত সুরভি মিশে বাতাসকে মন্থর করে দিচ্ছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে তার বন্দী জীবন। কিন্তু সে তো বাচ্চা, শক্তি তার কতোটুকু! অরণ্যের ডাক বা মানুষের ডাক,—এদের চেয়ে তার কাছে অনেক বড়ো মা-র ডাক। নিরুপায় বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে মা-র পিছনে পিছনে লোকালয়ে ফিরে চলল সে মাকে ছেড়ে সে যাবে কোথায়?

কিন্তু মা-র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে তার দেরি হোলো না। থ্রি ঈগল্‌স্ দল ছেড়ে চলেছিল ম্যাকেঞ্জি নদী বেয়ে গ্রেট স্লেভ হ্রদ অঞ্চলে। গ্রে বিভারের ধার ছিল থ্রি ঈগল্‌স্-এর কাছে। এক টুকরো লাল কাপড়, একটা ভালুকের চামড়া, বিশটা কার্তুজ আর কিচেকে দিয়ে সে ধার শোধ দিল। মাকে থ্রি ঈগল্‌স্-এর নৌকোয় উঠতে দেখে হোয়াইট ফ্যাঙও চেষ্টা করল নৌকোয় উঠতে। থ্রি ঈগল্‌স্-এর লাঠির এক ঘায়ে সে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, নৌকো ছেড়ে দিল। তার মাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে ঐ নৌকোয়। হোয়াইট ফ্যাঙ গ্রে বিভারের চিৎকার না শুনে ঝাঁপ দিল জলে। প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল নৌকোটার পিছু পিছু। তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে যে? জলে আর-একটা নৌকো নামাল গ্রে বিভার। জল থেকে হোয়াইট ফ্যাঙকে টুঁটি ধরে তুলে আছড়ে ফেলল নৌকোর মধ্যে। তার আগে কয়েক ঘা ঘুসি মারতে বাকি রাখল না।

বাচ্চাটার তখন আর কোনো খেয়াল নেই। সে কেবল পাগলের মতো ভাবছে নেই, মা নেই,—মা-র কাছে তাকে ওরা যেতে দিচ্ছে না। সে ভুলে গেল যে মানুষ দেবতা। রাগে হতাশায় কামড় লাগিয়ে দিল গ্রে বিভারের পায়ে।

এবার সে যে মার খেল আগের মার তার কাছে কিছুই না। গ্রে বিভার রাগে আগুন হয়ে উঠেছে। এবার আর হাত দিয়ে নয়, নৌকোর কাঠের দাঁড় দিয়ে গ্রে বিভার তাকে সমানে পিটোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে

লাথি। তার সারা গায়ে এমন কোনো জায়গা রইল না যেখানে আঘাত না পড়ল। শিক্ষা হোলো হোয়াইট ফ্যাঙের, চরম শিক্ষা। মানুষকে কামড়ালে তার ক্ষমা নেই। যাই হোক না কেন, মানুষ অস্পৃশ্য,—যে মানুষ তার প্রভু, তার দেবতা। এই শিক্ষায় ভুল হলে কোনো নিস্তার নেই আর।

গ্রে বিভারের নৌকো তীরে এসে লাগতেই সে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে আছড়ে ফেলল তীরের ওপর। কিঁ কিঁ করে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, ঠিক তক্ষুনি তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল চিরশত্রু লিপ-লিপ। তীরে দাঁড়িয়ে লিপ-লিপ এতক্ষণ মজা দেখছিল, এবার তাকে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপর দাঁত বসিয়ে দিল। আত্মরক্ষার চেষ্টা করার শক্তিটুকুও তার আর নেই। কিন্তু বেঁচে সে গেল সে যাত্রা। লাথি ছুঁড়ল গ্রে বিভার, সেই লাথির ঘায়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল লিপ-লিপ। এই তো মানুষ-প্রাণীর উপযুক্ত ব্যবহার। অন্যায় অত্যাচারকে সে প্রশ্রয় দেয় না; আর যখন শাসন করে তখন একলাই করে,—অন্য কোনো জানোয়ারকে দলে ভিড়িয়ে নয়। অনেক মার খাওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট ফ্যাঙের চোখ গ্রে বিভারের প্রতি শ্রদ্ধায় ছলছলিয়ে উঠল।

সেদিন রাত্রে সব যখন চুপচাপ, মা-র বিহনে আকুল হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মন। তার কান্নার আওয়াজে গ্রে বিভারের ঘুম ভেঙে গেল। সান্ত্বনার বদলে ঠ্যাঙানি খেল সে আবার।

এর পর থেকে মানুষজনের সামনে সে আর জোরে কাঁদত না। কিন্তু যখনি পায়ে পায়ে বনের ধারে গিয়ে দাঁড়াত কিছুতেই সামলাতে পারত না নিজেকে, মা-র দুঃখে একলা একলা কাঁদতে সুরু করত চিৎকার করে। বারে বারে অরণ্য তাকে টানত, কিন্তু পা তার সরতই না। মানুষের দল চলে যায়, আবার ফিরেও তো আসে। মা-ও

তার একদিন হয়তো ফিরে আসবে। তাই বন্ধন এড়ানো তার হোতো না।

তার বন্ধন যে অবিমিশ্র দুঃখের ছিল তাও নয়। তার ঔৎসুক্যের খোরাক মুহূর্তে মুহূর্তে জুটত মানুষের আশ্রয়ে। তাছাড়া পরিপূর্ণ দাসত্বের শিক্ষা তার হচ্ছিল। দাসত্বের বিনিময়ে মানুষের দয়াদাক্ষিণ্যের পরিচয়ও সে পাচ্ছিল।

গ্রে বিভার কখনো তাকে নরম করে আদর করত না। তবে মাঝে মাঝে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিত, অন্ত কোনো কুকুর সে মাংস খেতে এলে তাড়িয়ে দিত তাদের। হয়তো প্রভুর এই দয়া, এই আশ্রয়, না হয় এমনকি তার শক্ত হাতের থাবড়া,—এই সব মিলিয়ে প্রভুকে তার ভালো লাগতে সুরু করেছিল। মেজাজ যতোই রুক্ষ হোক, তার প্রতি কি একটা আকর্ষণও জন্মাচ্ছিল ধীরে ধীরে। যদি বা মরেও যেত প্রভুর হাতে, তবু সেই মারও যেন বন্ধনকে শক্ত করে তুলছিল।

এমনি করে দিন যায়। কিচের বিরহ হোয়াইট ফ্যাঙ ভোলে না, অরণ্যের মুক্ত জীবনের আহ্বান ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে এসে বাজে, তবু আস্তে আস্তে সে পোষ মানে, নিজেরই অজান্তে মানুষ-প্রভুর সঙ্গে তার বাঁধন অচ্ছেদ্য হয়ে যায়।

নির্বান্ধব

লিপ-লিপ দুবিসহ করে তুলেছে হোয়াইট ফ্যাঙের জীবন। এর ফল হচ্ছে সাংঘাতিক। হোয়াইট ফ্যাঙ দিনে দিনে হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে উঠছে। নেকড়ের রক্ত তার শিরায় শিরায়, তবু যতোটা বন্য তার না হলেও চলত, তার চেয়ে অনেক বেশি বন্য সে হয়ে উঠছে। মানুষেরাও দেখছে, তার মতো পাজি শয়তান কুকুরদের মধ্যে দুটি নেই। কুকুরদের মধ্যে যেখানে মারামারি, চোরাই মাংস নিয়ে যেখানে কাড়াকাড়ি সেখানে হোয়াইট ফ্যাঙ আছেই। কুকুরদের সব কিছু প্রাণ-অতিষ্ঠ-করা শয়তানীর মূলে সে ছাড়া আর কেউ নেই। সে চোর, সে গুণ্ডা, সে নেকড়ের বাচ্চা,—স্ত্রীলোকেরা তার দিকে ঢিল উচিয়েই আছে।

সারা ক্যাম্পে, কী মানুষ কী কুকুর, বন্ধু তার কেউ নেই। এখানকার সমস্ত কুকুরবাচ্চার নেতা লিপ-লিপ। তারা আপনা থেকেই যেন উপলব্ধি করেছে, সে তাদের থেকে আলাদা। জঙ্গলের নেকড়ে তাদের কাছে একঘরে। লিপ-লিপের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা সবাই তাকে মারার ফিকির খোঁজে। লড়াই লেগেই আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলে হোয়াইট ফ্যাঙের সঙ্গে তাদের কারুরই এঁটে ওঠা দুষ্কর। তারা কিন্তু সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হোয়াইট ফ্যাঙের ওপর। তবু যতো না মার খায়, তার চেয়ে বেশি মার দেয় হোয়াইট ফ্যাঙ।

এই দলবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে দুটি দামী জিনিষ সে শিখেছে;—অনেকের সঙ্গে লড়াইতে কী কৌশলে আত্মরক্ষা করতে হয়, আর দলছাড়া কুকুর একটাকে বাগে পেলে স্বল্পতম সময়ের

মধ্যে কঠোরতম আঘাত কী উপায়ে হানতে হয়। প্রথমত সে শিখেছে, যতোগুলো মিলেই তাকে আক্রমণ করুক না কেন, চার পা মাটিতে তার থাকবেই। এমনকি বড়ো বড়ো কুকুর ধাক্কা মেরে তাকে পিছনে বা এপাশে ওপাশে ছিটকিয়ে ফেলেছে, কিন্তু পা তার মাটি থেকে নড়েনি।

কুকুরদের লড়াই-এর সুরু কায়দা দিয়ে। তারা মুখোমুখি দাঁড়ায়, পিঠের লোম আর পিছনের পা শক্ত করে, দাঁত বার করে ভয় দেখায়, গোঁ গোঁ গর্ গর্ আওয়াজ করে। এসব প্রাথমিক তড়পানিগুলো হোয়াইট ফ্যাঙ পরিহার করেছে। কখন্ কেমন ভাবে আক্রমণ সে করবে তার হদিশ সে দেয় না। নিঃশব্দে বিদ্যুতের মতো সে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রস্তুত হবার আগেই দাঁতের মোক্ষম কামড় জায়গা মতো বসিয়ে এক ঝটকায় সে দূরে সরে যায়। সে জানে হঠাৎ আচমকা আঘাত যদি হানতে পারে তাতেই কেল্লাফতে। প্রতিদ্বন্দ্বী কী হোলো বোঝবার আগেই এক লহমায় সে এক কামড়ে তার কান ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে বা কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে মাংস পর্যন্ত গর্ত করে দিয়েছে,—তবেই না তার জয় নিশ্চিত!

আচমকা আক্রমণের আর একটা সুবিধে আছে। এতে সহজে শত্রুকে উল্টিয়ে ফেলা যায়, নাগালের মধ্যে আসে তার গলার তলাকার নরম অংশটা। এই অংশটাই হোলো জীবনের চাবিকাঠি। হঠাৎ আক্রমণে শত্রুকে চিৎ করে ফেলে একেবারে তার গলাটা কামড়ে ধরাই হোলো হোয়াইট ফ্যাঙএর যুদ্ধপ্রণালীর বিশেষত্ব। কামড়টা মারাত্মক হতে পারে বাচ্চা ফ্যাঙের চোয়ালে এতটা জোর এখনো হয়নি,—তবে তার উদ্দেশ্যের নিদর্শনস্বরূপ অনেক কুকুরবাচ্চাকে দেখা যায় ঠিক গলার শ্বাসনালীর কাছে কামড়ের ক্ষত নিয়ে ককিয়ে বেড়াতে। এমনি ক্ষত দেখলেই লোকে বুঝতে পারে এ কার কাজ। কুকুরদের যারা মালিক তারাও এর বিনিময়ে তাকে বেদম শাস্তি দিতে কসুর করে না।

কুকুর আর মানুষ—কেউই তার বন্ধু নয়, সকলের ঘৃণায় ঘৃণায় বড়ো হচ্ছে হোয়াইট ফ্যাঙ। এক মুহূর্তের জন্যে তার স্বস্তি নেই,—মানুষের হাত আর কুকুরের দাঁত,—তার ভাগ্যের ওপর সদা উদ্যত অস্ত্র। যারা তার নিজের জাতের তারা তাকে সম্ভাষণ জানায় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বার করে, আর যারা দেবতা তারা দেয় গালাগাল, মারে ইঁট ছুঁড়ে। সারাটা দিন তার নিত্য-উত্তেজিত নিমেষের সমষ্টি। সর্বদাই সে তটস্থ হয়ে আছে,—কখন তার ওপর আসবে আক্রমণ, কখন সে আক্রমণ করবে পাল্টা, মাথায় কখন ভেঙে পড়বে ইঁট পাথরের বৃষ্টি। সর্বদা সে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে হয় দাঁত বার করে ঝাঁপিয়ে পড়তে, না হয় ভয়-দেখানো গর্জন করে লাফিয়ে পালাতে।

তার গর্জনের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে না সমবয়সী আর কেউ। বৃথা সে গজরায় না, জানে কখন গজরানো দরকার। যখন সে গজরায়, তখন গর্জনের মধ্যে তার মনের সমস্ত ঘৃণা রাগ আর বীভৎসতা সে ঢেলে দেয়। বারে বারে কালো নাকটা কুঁচকোতে থাকে, পিঠের লোম খাড়া হয়ে ওঠে ঢেউএর মতো, লকলকে লাল জিভ সাপের ফণার মতো হিস্ হিস্ করে মুখের গহ্বর থেকে বার হয় আবার ঢোকে। তার সেই ভয়ংকর গজরানিতে অনেক বড়ো বড়ো কুকুর পর্যন্ত হঠাৎ আতংকে থমকে পিছু হটে।

কুকুরবাচ্চার দল তাকে একঘরে করেছে। প্রতিফলও পাচ্ছে। দল যেমন তার শত্রু, তেমনি কোনো কুকুরবাচ্চা যদি একবার দলছাড়া হয় তাহলে আর সেটার নিস্তার নেই। লিপ-লিপের নেতৃত্বে তারাই হোয়াইট ফ্যাঙকে সাংঘাতিক শত্রু করে তুলেছে, তাই তাদের প্রত্যেকেরই আতংক দলছাড়া হতে। নদীর ধারে কোনো কুকুরবাচ্চা একবার একলা গিয়ে পড়লে হয়। তাকে আর ফিরতে হয় না;—যদি বা ফেরে তো ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে কাতর আর্তনাদে পাড়া মাথায় করে।

কুকুরবাচ্চারা সবাই বেশ বুঝেছে যে জোট বেঁধে থাকতেই হবে। কিন্তু তাতেও কি তাদের নিস্তার আছে? কাউকে একলা পেলে হোয়াইট ফ্যাঙ যেমন আক্রমণ করে, তেমনি জোট বাঁধা অবস্থায় তারাও তেড়ে যায় হোয়াইট ফ্যাঙকে দেখলেই। এমনি অবস্থায় হোয়াইট ফ্যাঙ ক্ষিপ্রগতিতে লাগায় দৌড়! দৌড়ে তার নাগাল পাওয়া শক্ত। কিন্তু যারা তাড়া করেছে তাদের মধ্যে কোনো একটা যদি দৌড়ের উত্তেজনায় দল ছেড়ে একটু এগিয়ে যায় তাহলে সেটাকে বাঁচায় কে? আক্রমণের অধীর আগ্রহে চিৎকার করতে করতে কুকুর-গুলো যখন হোয়াইট ফ্যাঙের পেছনে ছোটে তখন প্রায়ই তারা ভুলে যায় কে কতোটা এগিয়েছে। কিন্তু ভুল হয় না হোয়াইট ফ্যাঙের। পালাতে পালাতেও সে পিছন ফিরে তাকায়, আর যে অত্যুৎসাহী কুকুরটা দল ছেড়ে তার সব চেয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এক চকিত আঘাতে তাকে ধূলোয় লুটিয়ে ফেলে। খেলাই তো কুকুর-বাচ্চাদের ধর্ম, তাদের প্রাণ। দলের বাচ্চাগুলোর প্রধান খেলা হয়েছে হোয়াইট ফ্যাঙকে তাড়া করা, তাকে মারবার চেষ্টা করা। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙএর কাছে এ খেলা খেলা নয়, পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই,—শক্তি দিয়ে, কৌশল দিয়ে, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা দিয়ে শত্রুনিপাতের প্রতি মুহূর্তের দুরন্ত প্রচেষ্টা।

শিশুসুলভ কোমলতা এক ফোঁটাও নেই হোয়াইট ফ্যাঙের চরিত্রে, শুকিয়ে গেছে সব দয়ামায়া। অগ্নিরুক্ষ তার বুক—সেখানে স্নেহ ভালোবাসা আদরের কোনো স্পর্শ নেই। সে ভুলেই গেছে ভালোবাসা কাকে বলে। সে সুধু শিখেছে যে শক্তিমান তাকে ভয় করতে, তার হুকুম তামিল করতে আর যে দুর্বল তাকে শাসন করতে, তার ওপর অত্যাচার করতে। গ্রে বিভার তার প্রভু, সে দেবতা—সে-দেবতার শক্তির শেষ নেই;—তাই মাথা হেঁট করে মান্য করতে হবে তাকে। কিন্তু ঐ কুকুরবাচ্চার দল,

যারা শক্তিতে তার চেয়ে কম, তাদের ধ্বংস করতে হবেই। কেন না, তাকে আঘাত করতে ওরা কেউ ছাড়ে? সুবিধে পেলে তার প্রাণ নিতে ওরা কেউ অখুসি?

দলছাড়া নির্বান্ধব একঘরে হোয়াইট ফ্যাঙ। আক্রমণের উদ্যম আর আত্মরক্ষার কৌশলে দিন দিন সে বলীয়ান হয়ে উঠছে। দৌড়ে কিম্বা লড়াইএর কৌশলে কোনো কুকুরবাচ্চা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনা, তার মতো হিংস্র কঠিন নিষ্ঠুর ভয়ানক আর কেউ নয়। ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর হয়ে বিকশিত হচ্ছে তার চরিত্র। এ না হলে উপায় কী? এ নইলে জীবনের যুদ্ধে হার হবে যে তার! সবাইকে যদি না ছাড়াতে পারে, তাহলে সবাইএর হাত থেকে তার মতো একলার পরিত্রাণ কোথায়?

মুক্তি আর বন্ধন

শীতকাল এল, ছোট হয়ে এল দিন ; বাতাসে কুয়াশার কামড়। এমনি সময় একদিন হোয়াইট ফ্যাঙের মুক্তির সুযোগ এল। ইণ্ডিয়ানদের গ্রীষ্মকালীন তাঁবু উঠছে ; দলবল চলেছে শীতের শিকারের সন্ধানে। তাঁবুর পর তাঁবু গুটোনো হচ্ছে, নৌকো ভর্তি হচ্ছে লোকজনে আর মালপত্তরে। হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝল মানুষ-প্রভুদের যাত্রা হোলো সুরু।

সুযোগ বুঝে হোয়াইট ফ্যাঙ আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে সরে পড়ল। গভীর একটা গুল্মকুঞ্জের মধ্যে সে ঘাপটি মেরে লুকোলো। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল সেখানেই। একবার হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে শুনল মানুষের গলা। তাকেই খুঁজছে। তার নাম ধরে বারে বারে ডাকছে গ্রে বিভার, তার স্ত্রী আর তার ছেলে মিটশা। ভয়ে ঘাপটি মেরে সে পড়ে রইল যতোক্ষণ না ডেকে ডেকে তার খোঁজ না পেয়ে মানুষরা আবার ফিরে গেল। তারপর মুক্তির উচ্ছ্বসিত আনন্দে এক লাফে সে ঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে এল। আপন মনে কতক্ষণ সে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে বেড়ালো, যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল ঘন হয়ে। তখন হঠাৎ তার মনে হোলো সে বড়ো একলা। চুপটি করে বসে সে কান পেতে শুনতে লাগল। চারদিক নিশ্চল, নিশ্চুপ। বড়ো বড়ো নিস্পন্দ গাছের ঝাঁকড়া ডাল ঘিরে অন্ধকার জমা হচ্ছে নিঃশব্দে। এই অন্ধকারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় কতো ভয়-দেখানো বিপদের প্রেত-মূর্তি যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে আছে।

ঠাণ্ডাও নামছে। এখানে নেই তাঁবুর আশ্রয়, লোকালয়ের আগুনের গরম তুষার জমছে পায়ের নিচে, পায়ে পায়ে চলতে তুষার উঠছে

ফিস্ ফিস্ করে। খিদেও পেয়েছে হোয়াইট ফ্যাঙের। কিন্তু খাদ্য তো নেই, নেই কেউ,—আছে সুধু চারদিক ঘেরা ভয়াল স্তব্ধতা। অন্ধকার রাত্রি হাঁ করে তাকেই খেতে আসছে।

সঙ্গহারা ফ্যাঙের সমস্ত শরীর হঠাৎ আতংকে শিউরে উঠল। ওটা কী! ঐ বিরাট কালো দৈত্যের মতো দেখতে? চাঁদের আলোয় লম্বা একটা গাছের ঝাঁকড়া মাথায় ছায়া! না, ভয় নেই। ভরসাও নেই তো! ডুকরে সে কেঁদে উঠল, পরক্ষণেই চুপ করল,—তার কান্নার শব্দে অরণ্যের অজানারা যদি গুঁড়ি মেরে আসে?

হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিল জোরে। ঠিক তার মাথার ওপর একটা গাছ সেই হাওয়ায় নড়ে চড়ে মর্মর শব্দ করে উঠল। আচমকা সেই শব্দে ভয়ে চিৎকার করে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ, তারপর পাগলের মতো দৌড় দিল জনবসতির দিকে। মানুষের আশ্রয়, মানুষের সঙ্গ তার চাই-ই। নাকে তার তাঁবুর আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ, কানে তার মানুষজনের গলার আওয়াজ। জঙ্গল থেকে দৌড়ে সে নদীতীরের খোলা জায়গায় গিয়ে পৌছল। এখানে আর ভয়-দেখানো গাছপালা নেই। কিন্তু তাঁবুও তো নেই! জনপদ ভেঙে গেছে, উধাও হয়েছে কোনো চিহ্ন না রেখে।

থমকে সে দাঁড়াল। পালাবে আর কোন্ আশ্রয়ে? একটি মানুষ নেই কোথাও। কোনো স্ত্রীলোক ঢিল উঁচিয়ে নেই তাকে মারবার জন্যে, কোনো লিপ-লিপ দাঁত খিঁচিয়ে নেই তাকে কামড়াবার জন্যে। গ্রে বিভারের তাঁবুটা যেখানে ছিল, সেই জায়গায় আস্তে আস্তে এসে পৌছল হোয়াইট ফ্যাঙ। চাঁদের দিকে নাক উঁচু করে পিঠ খাড়া করে সে বসল। গলা তার কাঁপতে লাগল কিসের যন্ত্রণায়, মুখ তার হাঁ হয়ে গেল, নির্জন রাত্রির মাঝখানে একলা বসে আকাশের একলা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে ছাড়ল একটিমাত্র সুদীর্ঘ আর্তনাদ। তার সমস্ত একাকীত্ব আর আতংক,

মা-র জন্যে তার এতদিনের বুক ভরা বিচ্ছেদ বেদনা, তার ছেলেমানুষির সব দুঃখ আর বড়ো হবার সব সংশয় সে ভরে দিল ঐ একটি সুদীর্ঘ কাতর কান্নার মধ্যে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আতংক কমল, কিন্তু নিঃসঙ্গতাবোধ বাড়ল। জংলা জায়গাটা পার হয়ে নদীর তীর ধরে সে দৌড়তে সুরু করল। এক মুহূর্ত না থেমে সারাদিন সে দৌড়ল। দেহে তার ক্লান্তি নেই, দেহ ক্লান্ত হলেও মনের অন্ধ শক্তি তার দেহকে টেনে নিয়ে চলল। পথে পাহাড় পড়ল, পাহাড় ডিঙিয়ে সে ছুটল। ছোট ছোট শাখা-নদী পড়ল, সাঁতরে সেগুলো পার হোলো, বরফ-জমানো কনকনে ঠাণ্ডা জল তাকে কাবু করতে পারল না। সে ছোটে আর অন্বেষণ করে, কোথাও মানুষ-দেবতাদের চিহ্ন মেলে কিনা।

দিন শেষ হয়ে এল। রাতের অন্ধকারেও তার ছোটার বিরাম নেই। তাকে বাঁধতে পারল না কালো রাতের কোনো বিপত্তি, কোনো বাধা। আবার যখন দিন এল তখনো সে ছুটছে। ত্রিশ ঘণ্টার বেশি সে ছুটেছে, প্রায় পুরো দুদিন তার পেটে কিছু পড়েনি। ধুলোয় কাদায়, নদীর তুষার-হিম জলে তার সারা গা নোংরা, ক্ষত বিক্ষত; তার পায়ের পাতা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। খুঁড়িয়ে সে ছুটছে, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন ভেঙে পড়ল বলে। তবু বিরাম নেই। এদিকে আকাশ ভরা কুয়াশা, বরফ পড়তে সুরু করেছে, দিনদুপুরেও চোখ ঠাহর করতে পারে না দু' কদম সামনে কী আছে কী নেই। পিছল তুষার-পথে বারে বারে সে পড়ছে, আবার উঠে দৌড়চ্ছে। এই দৌড়েই সে বাঁচবে,—তার মিলবে মানুষের আশ্রয়, মানুষের হাতে বন্ধনের মধ্যে মুক্তি।

আবার রাত্রি যখন ঘনিয়ে এল, তখন ফ্যাঙ পথরেখা পেল একটা, মাটি শুঁকে শুঁকে কিসের পেল নিশানা। উৎসুক আগ্রহে তার ক্লান্ত ছোট্ট বুক থেকে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে

আরো কিছুটা এগিয়ে নদীতীর ছেড়ে পাশের গাছপালায় মধ্যে সে ঢুকল। তার কানে ভেসে এল লোকালয়ের গুঞ্জন, নাকে এল আগুনের গন্ধ। চোখের সামনে তাঁবু, গ্রে বিভারের স্ত্রী রান্না করছে, আর তার সামনে বসে খাচ্ছে গ্রে বিভার, হাতে তার টাটকা রান্না করা মাংসের মস্ত একটা টুকরো!

চুপ করে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ। আপনা থেকেই খাড়া হয়ে উঠল তার পিঠের লোম। নির্ঘাত সে মার খাবে, প্রচণ্ড মার। মার খেতে তার আপত্তি প্রচণ্ড ;—কিন্তু মারুক, মারুক, দেবতাই তো মারবে। শত্রুই হোক আর বন্ধুই হোক সঙ্গ তো তার মিলবে! আর নিঃসঙ্গ মানেই তো নিরাশ্রয়!

চোরের মতো গুঁড়ি মেরে আগুনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। তার দিকে চোখ পড়তেই খাওয়া বন্ধ হোলো গ্রে বিভারের। চরম ক্লান্তি নিয়ে আর আত্মসমর্পণের পরম দীনতায় আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে ফ্যাঙ এসে শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ল গ্রে বিভারের পায়ের তলায়,—আমাকে নাও, আমার দেহমন সব তোমাকে দিলাম, আমাকে বাঁচাও! আবার ফিরে এসেছি, নিজে এসে পায়ে লুটিয়েছি, বাঁধো আমায়, ফিরিয়ে দিয়ো না।

থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙের পিঠ। কই, ঘা তো পড়ল না পিঠের ওপর! মাথাটা একটু তুলে কুঁতুল কুঁতুল চোখে সে তাকাল। মাংসের টুকরোটা ছিঁড়ছে তার দেবতা, এক টুকরো ধরেছে তার মুখে!

জুটল আশ্রয়, মিলল পেট ভর্তি খাদ্য। তারপর আগুনের ধারে গ্রে বিভারের পায়ের কাছে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে ফ্যাঙ ঝিমুতে লাগল। আবার কাল সকাল হবে। কাল আর ভয় নেই। নিথর নিস্তব্ধ সঙ্গহীন মরুপ্রান্তরে তার ঘুম কাল ভাঙবে না, ভাঙবে

দেবতাদের রাজ্যে, দেবতার আশ্রয়ে। চোখ বুজল সে প্রসন্ন শান্তিতে।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। গ্রে বিভার তাঁবু ভেঙে ম্যাকেঞ্জি নদীর উজান অঞ্চলে যাত্রা শুরু করল। সঙ্গে মিট্‌শা আর স্ত্রী, ক্লু-কুচ। বড়ো বড়ো কুকুর বাঁধা একটা স্লেজে সে আর তার স্ত্রী। আর একটা ছোট স্লেজে ছেলে মিট্‌শা। মিট্‌শার স্লেজটা টানবে একদল কুকুরবাচ্চা। মিট্‌শা শিখবে কেমন করে স্লেজ চালাতে হয়, স্লেজ-টানা কুকুরদের বশে রাখতে হয়। বড়ো মানুষের কাজে এই তার হাতে খড়ি। তা ছাড়া ছোট স্লেজে মালপত্রও কিছু থাকবে। বড়ো স্লেজের ভার লাঘব হবে তাতে।

অন্য সব কুকুরবাচ্চার মতো হোয়াইট ফ্যাঙেরও পিঠে বল্গা বাঁধা হোলো। তার গলায় বাঁধা হোলো একটা পাকানো খড়ের শক্ত বগলস, আর একটি ভারী বগলস পেট-পিঠ ঘিরে, দুটো চামড়ার ফালি দিয়ে দুটো বালিস জোড়া। এই দ্বিতীয় বালিসটার সঙ্গে লম্বা দড়ি, সেটা আটকানো স্লেজের গায়ে।

দলে সবসুদ্ধ সাতটা কুকুরবাচ্চা। অন্যগুলোর কারুর বয়েস ন-দশ মাসের কম নয়। হোয়াইট ফ্যাঙই দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, তার বয়েস মাত্র আট মাস। প্রত্যেকটা কুকুরবাচ্চারই পিঠের বগলসের সঙ্গে দড়ির লাগাম। কোনো লাগামটাই সমান লম্বা নয়, দৌড়বার সময় একটা কুকুর যাতে আর একটাকে ছুঁতে না পারে, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। স্লেজের সামনে লোহার একটা শক্ত আংটায় প্রত্যেক লাগামের অপর দিকটা আটকানো।

কুকুরগুলো যখন টানে, দলটাকে দেখায় অর্ধবৃত্তাকারে ছড়ানো একটা পাখার মতো। এতে কুকুরে কুকুরে পায়ে পায়ে ধাক্কা লাগার

কোনো ভয় নেই। পিছন থেকে কোনো একটা কুকুর যে সামনের কুকুরকে আক্রমণ করবে তারও উপায় নেই। সামনের কুকুর অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, তবে সে হবে মুখোমুখি লড়াই। তাছাড়া সে শুধু সঙ্গী কুকুরের মুখোমুখি নয়, চালকের চাবুকেরও মুখোমুখি হবে। কুকুরের ধর্মই হচ্ছে সামনের জাতভাইকে তাড়া করা। যতোই এমনি এ-ওকে তাড়া করবে, মজা এই যে শ্লেজও ততো জোরে চলবে, আর সামনের কুকুরও পেছনের কুকুরকে ততোই দূরে রাখতে পারবে। এই হচ্ছে কুকুরের বুদ্ধির ওপর মানুষের বুদ্ধির বাহাদুরি।

মিট্‌শার বুদ্ধি তার বাপেরই মতো। কুকুরবাচ্চাদের দলে লিপ-লিপও ছিল। আগে লিপ-লিপের প্রভু ছিল অন্য একজন। তাই সে যখন হোয়াইট ফ্যাঙের ওপর অত্যাচার করত, মিট্‌শা রাগলেও পরের কুকুরের গায়ে হাত দিতে পারত না। লিপ-লিপকে তার বাবা কিনে তার হাতে দিয়েছে। মিট্‌শা এবার তাকে খুব শাস্তি দিল। তাকে রাখল দলের সব কুকুর-বাচ্চার আগে সবচেয়ে লম্বা দড়ির লাগামে বেঁধে। সবার আগে সে চলবে, সে-ই যেন দলপতি, আসলে কিন্তু আর সব কুকুরের সে তাড়া খাবে, দৌড়োবে প্রাণপণে। আর একবার পিছন ফিরেছে কি মিট্‌শার হাতের কড়া চাবুক। অন্য কুকুররা দৌড়ের সময় লিপ-লিপের লাল হাঁ আর দাঁতখিচোনো মুখ আর দেখে না, দেখে তার ল্যাজ। সারা দিনের দৌড়ের সময় যারা তাকে নির্ভয়ে অনুসরণ করে, ছাড়া পেলেও তারা থামে না। তেড়ে যায় তারা লিপ-লিপের পিছনে; ভয় তাদের কেটেছে, এদিকে আজকাল দলপতি লিপ-লিপ দল ছেড়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালায়, মানুষের আশ্রয়ে এসে লুকোয়। এমনি করে মিট্‌শা লিপ-লিপের দম্ভ ভাঙল।

হোয়াইট ফ্যাঙ আপন মনে তার কাজ করে। লিপ-লিপের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কুকুরবাচ্চারাও এতদিন তাকে জ্বালিয়েছে কম নয়। সে

ভোলবার নয়। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চাইতে মানুষের কথা শোনা অনেক বেশী পছন্দ করে ফ্যাঙ। মানুষকে সে দেবতা বলে মেনেছে, মানুষের হুকুম মেনে কঠোর পরিশ্রম করতে, অধ্যবসায়ী নিয়মানুবর্তী হতে সে পিছপাও নয়। নেকড়ে যদি পোষ মানে, তাহলে তার মতো প্রভুভক্ত আর কোনো জন্তু হয় না। এই গুণ হোয়াইট ফ্যাঙের মধ্যে খুব বেশী মাত্রাতেই আছে।

লিপ-লিপের পতনের পর হোয়াইট ফ্যাঙ সহজেই কুকুরবাচ্চাদের দলপতি হতে পারত। কিন্তু সে সাধ তার নেই। অন্য কুকুরবাচ্চাগুলো হোয়াইট ফ্যাঙের সঙ্গী, কিন্তু খেলার নয়, যুদ্ধের। সম্পর্কটা বন্ধুত্বের নয়, বৈরতার। হয় সে ওদের সঙ্গে লড়াই করে, নয় ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। সে শিখেছে শক্তের ভক্ত হতে আর নরমের ওপর অত্যাচার করতে। ওরা তাকে যমের মতো ভয় পায়, ওকে দেখলে দূরে পালায়। কেউ যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সে তার আর রক্ষা রাখে না। দলের মধ্যে সে দলছাড়া, দুর্মদ অত্যাচারী শাসক। তার সঙ্গে লড়াইতে কেউ পারে না। লড়াই আরম্ভ হতে-না-হতেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝবার অবসর না দিয়েই সে তাকে প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। সবাইকে সে কঠোর শাসনে রাখে। ইস্পাত-কঠিন নিষ্ঠুর তার বিধান, মারাত্মক তার শা[illegible]কে শাস্তির মধ্যে তার ক্রুর অন্তরের সমস্ত প্রতিহিংসা সে [illegible]
খাতির করে সে মানুষকে আর বড়ো কুকুরকে। নিজের দলে[illegible]শা জঙ্গলের নির্মম বিধাতা। [illegible]র হাত হোয়াইট

মাসের পর মাস কাটছে। যাত্রার শেষ নেই ফ্যাঙ। ছেলেটার টানার পরিশ্রমে হোয়াইট ফ্যাঙের শক্তি বাড়ছে। [illegible]ল মিট্[illegible]শার সঙ্গে। অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতায় কোমলতার লেকে মারতে লাগল। দেবতার মধ্যেই যে কোমলতা নেই এতটুকু চোখ পিট পিট করে।

হোয়াইট ফ্যাঙের মনে ভালোবাসার কণামাত্র নেই, আছে ভক্তি, বশ্যতা। কেন না সে মানুষ, সে বুদ্ধিমান আর শক্তিমান। প্রভুর কাছে মিষ্টি হাতের আদর সে কখনো পায় না, শোনে না মিষ্টি গলার ডাক। প্রভু তার রুক্ষ, দুর্দম। পেট ভরে যেমন খেতে দেয়, তেমনি শাস্তি দেয় সাংঘাতিক। কথা না শুনলে লাঠি মেরে পিঠ ভাঙে, কথা শুনলে লাঠি মারে না, এইটুকুই পুরস্কার। যেমন ভৃত্য তার তেমনি প্রভু। দয়ামায়ার রসকসহীন এই কঠোর প্রভুত্বই সে চিনেছে, এরই মোহে সে জঙ্গল থেকে আবার ফিরে এসেছে।

মানুষের হাতের স্পর্শে কতোটা মাধুর্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে, তার পরিচয় হোয়াইট ফ্যাঙ পেল না। মানুষের স্পর্শ তার সয় না। যে হাত লাঠি মারে ইট ছোঁড়ে বেত উঁচোয়, তাকে সে পরিহার করে চলে। সবচেয়ে সে এড়িয়ে চলে শিশুর হাতকে। ছোট মানুষের হাত অকারণে নিষ্ঠুর, এই তার অভিজ্ঞতা।

গ্রেট স্লেভ হ্রদের ধারে একটা গ্রামে এসে একদিন গ্রে বিভারের তাঁবু পড়ল। ছাড়া পেয়ে গ্রামের অন্য সব কুকুরের মতো হোয়াইট ফ্যাঙও বার হোলো খাবারের সন্ধানে। এক জায়গায় দেখল একটা ছেলে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শুকনো হরিণের মাংস আর হাড় কাটছে। মাংসের কয়েকটা বরবাদ কুচি কুড়ুলের ঘায়ে মাটিতে দৌড়ের সময় ছিটকে পড়ছে। হোয়াইট ফ্যাঙ আস্তে আস্তে এগিয়ে মুখ নিচু করে না। তেড়ে যাওয়া খেতে লাগল। ছেলেটা নিঃশব্দে কুড়ুলটা রেখে একটা আজকাল দলপতি নিল হাতে। লাঠির ঘা মাথায় পড়বার আগেই হোয়াইট আশ্রয়ে এসে লুকোয় গেল। ছেলেটা লাঠি নিয়ে তাড়া করল তাকে।

হোয়াইট ফ্যাঙ রাস্তাঘাট চেনা নেই ফ্যাঙের। পালাতে পালাতে সঙ্গে অন্য কুকুরবাচ্চারাও একটা অন্ধ গলিতে আটকা পড়ে গেল।

ছেলেটা তার পথ আটকিয়ে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এল। রাগে আগুন হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ। এ কী অন্যায়! ধুলোয় পড়া এমনি বরবাদ শুকনো মাংসের কুচি তো কুকুরেরই প্রাপ্য, যে পায় তারি। অন্যায় সে কী করেছে? তবু তাকে মারবে? আর অমনি ঐ ভীষণ মোটা লাঠি দিয়ে? বিকট মুখব্যাদান করে সে এগিয়ে গেল, হারিয়ে ফেলল সম্বিত। সেই মুহূর্তে কী যে ঘটে গেল বুঝল না সে, ছেলেটাও না। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, ছেলেটা উল্টে পড়েছে মাটিতে, যে-হাতে লাঠি সে ধরেছিল কুকুরের দাঁতের একটি কামড়ে সে হাতে এক খাবলা রক্তঝরা ক্ষত।

হোয়াইট ফ্যাঙও পরমুহূর্তেই উপলব্ধি করল, দেবতাকুলের সবচেয়ে বড়ো আইন সে ভেঙেছে, তাদের একজনের পবিত্র দেহে সে কামড় বসিয়েছে। এবার আসছে চরম শাস্তি। হাঁফাতে হাঁফাতে পালাতে পালাতে সে পৌঁছল গ্রে বিভারের কাছে, প্রভুর পায়ে নিল আশ্রয়। ছেলেটার আত্মীয়স্বজন ছুটে এল রাগে হিংসায় গর্ গর্ করতে করতে। কিন্তু শাস্তি সে পেল না। গ্রে বিভার ক্লু-কুচ আর মিট্‌শা একসঙ্গে মিলে ছেলেটার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে প্রবল ঝগড়াঝাটি করে তাকে বাঁচাল। সে বুঝল দেবতারাও ন্যায় অন্যায় সত্যি সত্যি বোঝে। অন্যায় সে করেনি, তাই তার প্রভু অন্যায় শাস্তির হাত থেকে তাকে রক্ষা করলো।

ঘটনাটার এইখানেই শেষ হোলো না। বিকেলবেলা মিট্‌শা জঙ্গলের ধারে কাঠ কুড়োতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ল সেই ছেলেটার যার হাত হোয়াইট ফ্যাঙ কামড়েছিল। মিট্‌শা একলা, সঙ্গে কেবল ফ্যাঙ। ছেলেটার দলে অনেকগুলো সঙ্গী। ছেলেটা ঝগড়া বাধাল মিট্‌শার সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে একজোট হয়ে মিট্‌শাকে মারতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ দূরে বসে দেখতে লাগল চোখ পিট পিট করে।

দেবতায় দেবতায় লড়াই, তার কী? একটু পরেই চকিতে তার খেয়াল হোলো, কিল চড় খুলির ধারাবর্ষণে যে ধরাশায়ী হয়েছে, সে তারই দেবতা, তারই প্রভুর ছেলে। ক্রোধের উন্মাদ আবেগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেগুলোর ওপর। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই অত্যাচারীর দল ফর্সা, অনেকেরই নানা অঙ্গ হোয়াইট ফ্যাঙের কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত। তাঁবুতে ফিরে এল মিট্‌শা, এই কাহিনী বাবা-মাকে বলতে গ্রে বিভার হোয়াইট ফ্যাঙকে একগাদা মাংস খেতে দিল। আগুনের ধারে অলস আরামে চোখ বুজে হাড় চিবোতে চিবোতে হোয়াইট ফ্যাঙ ভাবতে লাগল,—ত্থাখো, মানুষের গোষ্ঠীর সঙ্গে সে লড়েছে, তবু তো তার এ লড়াইকে সমর্থন করেছে মানুষ প্রভু!

দুর্ভিক্ষের দিন

গ্রে বিভারের যাত্রা শেষ হতে হতে গড়িয়ে এল বসন্তকাল। এপ্রিলমাসে একদিন গ্রে বিভারের দল তাদের পুরোনো গ্রামে এসে পৌছল। মিট্‌শার স্লেজ থেকে হোয়াইট ফ্যাঙ মুক্তি পেল, খসে গেল লাগাম বগলস। তার বয়স তখন ঠিক একবছর। বড়ো হতে তার তখনো অনেক দেরি, তবু কুকুরবাচ্চাদের মধ্যে তার চেয়ে বড়ো চেহারা লিপ-লিপ ছাড়া আর কারো নেই। শক্তি আর বাড়ন্ত গড়ন সে পেয়েছে তার বাপ-মার কাছ থেকে, বড়ো কুকুরদের সমান সমান হওয়ার বাসনা তার মনের মধ্যে জাগতে আরম্ভ করেছে। মা-র কাছ থেকে কুকুরের রক্ত কিছুটা পেলেও সে তো কুকুর নয়, নেকড়ে। জাত-নেকড়ে সে, আচারে ব্যবহারে কুকুর হলেও।

গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে ম্যাকেঞ্জি নদীর ধারের আগের জনপদের অনেক চেনা দেবতার মুখ লক্ষ্য করল। চেনা কুকুরবাচ্চাও চোখে পড়ল, তারাও বড়ো হয়েছে তারই মতো। পুরোনো চেনা কুকুরদের সে বারে বারে দেখল। আগে তাদের যতোটা বিরাট আর ভয়ংকর বলে মনে হোতো, এখন তার ততোটা লাগছে না। সেও যে বড়ো হয়েছে!

ঝাঁকড়া লোমওয়ালা বুড়ো একটা কুকুরকে সে কী ভয়ই করত আগে! নাম তার বাসিক। তাকে দেখলেই সে বড়ো বড়ো দাঁত বার করত আর সেই দাঁত দেখেই মূর্ছা যেত আর কি বাচ্চা ফ্যাঙ! এখন বুড়ো বাসিকের শক্তি কমছে, জোয়ান ফ্যাঙের শক্তি বাড়ছে।

সারা কুকুর-জগতের সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙের আগেকার সম্পর্ক ছিল আতংকের, পলায়নের। সম্পর্কটার পরিবর্তন যে হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই তার প্রমাণ হোলো।

সেদিন সম্ভ একটা হরিণ মেরে তার মাংস ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। হোয়াইট ফ্যাঙের ভাগ্যে জুটেছে ক্ষুরসমেত পায়ের একটা মাংসালো হাড়। অন্য কুকুরদের কাড়াকাড়ি এড়িয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ সবে আহার সুরু করবে, এমনি সময়ে তার সামনে লাফিয়ে এল বুড়ো কুঁদো বাসিক। সঙ্গে সঙ্গে দুই ঝট্‌কায় বাসিকের গায়ে দুই কামড় লাগিয়ে এক লাফে সরে এল হোয়াইট ফ্যাঙ। বাচ্চাটার সাহস আর তৎপরতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল বাসিক। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইল, দুজনের মাঝখানে পরম লোভনীয় টাটকা মাংস-জড়ানো হাড়ের টুকরোটা।

বুড়ো হয়ে গেছে বাসিক। আগে যাদের ওপর সমানে সে তর্জন করত সেই সব উঠতি কুকুরদের বাড়ন্ত ক্ষমতার তিক্ত অভিজ্ঞতা আজকাল তার হচ্ছে। আগের দিন হলে সে এক লহমায় হোয়াইট ফ্যাঙের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে তাকে ছিঁড়ত, কিন্তু আজকাল শক্তিতে তার ভাঁটা পড়েছে, কমেছে তার বড়াই। সারা গায়ের ঝাঁকড়া লোম ফুলিয়ে ভয়ংকর দৃষ্টিতে সে হোয়াইট ফ্যাঙের দিকে তাকাল। পুরোনো আতংকের স্মৃতিতে সেই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। ভাবতে লাগল পালাবে কিনা এক পা এক পা করে।

হোয়াইট ফ্যাঙ সরেই হয়ত পড়ত তার মুখের গ্রাস ছেড়ে, কিন্তু বাসিক ভুল করল এইখানে। বাসিক ভাবল, জয় তো তার হয়েছেই। দৃষ্টি নামিয়ে মাংসখণ্ডটার কাছে সে গেল। মাংসটা সে যখন নাক নিচু করে শুঁকল, পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙের। মাংসের সামনে

দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে যদি বাসিক গনগনে দৃষ্টিতে হোয়াইট ফ্যাঙের দিকে তাকিয়ে থাকত কিছুক্ষণ, হোয়াইট ফ্যাঙ ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়তে দ্বিধা করত না। কিন্তু টাটকা মাংসের লোভে আকুল হয়ে বাসিক মুখ নিচু করে তাতে এক কামড় দিল।

ব্যস, এই যথেষ্ট। তারই খোরাক, আর তার চোখের সামনে অন্যের পেটে তা যাবে? সে চুপ করে তা দেখবে? বৃথাই তার এতদিনের কুকুরবাচ্চার দলের সর্দারি! নিঃশব্দে চকিতে আক্রমণ করল হোয়াইট ফ্যাঙ। প্রথম কামড়েই বাসিকের ডান কানটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। চমকে উঠল বাসিক। অবাক হবার আর একটুও অবসর সে কিন্তু পেল না। এক ধাক্কায় হোয়াইট ফ্যাঙ তাকে মাটিতে লুটিয়ে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের এক মোক্ষম কামড় ঠিক তার গলার নলীর ওপর। তাকে ঝেড়ে ফেলে বাসিক উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পর পর আর দুটো কামড় পড়ল তার দু-কাঁধে। কী তীব্র গতি হোয়াইট ফ্যাঙের! বিদ্যুতের মতো সে লড়ে। রাগে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করে বাসিক ঝাঁপ দিল ফ্যাঙের ওপর। কিন্তু বৃথা সে আক্রমণ, শত্রুর নাগালও সে পেল না। পরমুহূর্তেই হোয়াইট ফ্যাঙের দাঁতের ঝলকে তার নাকটা দুখানা হয়ে গেল। টলতে টলতে মাংস ছেড়ে কয়েক পা দূরে গিয়ে সে দাঁড়াল।

চাকা ঘুরেছে। মাংসটাকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যাঙ, এবার পিঠের লোম খাড়া করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে এখন গজরাচ্ছে, আর দূরে দাঁড়িয়ে কুঁদো বাসিক ভাবছে, মানে মানে পিছু হটলে কেমন হয়? এমনি বিদ্যুতের মত বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করা তার কর্ম নয়! গম্ভীর মুখে বীরত্বের ভান দেখিয়ে পশ্চাদপসরণ করল সে,—ঐ একটা পুঁচকে বাচ্চা আর তার মাংসের টুকরোকে যেন সে থোড়াই কেয়ার করে। দৃষ্টির বাইরে অনেক দূরে যাবার পর সে থামল হোয়াইট ফ্যাঙের কামড়ে রক্তমাখা ঘা-গুলো চাটবার জন্যে।

এই ঘটনার পর থেকে হোয়াইট ফ্যাঙের মনে জন্ম নিল নতুন গর্ব, নতুন আত্মবিশ্বাস; বড়ো কুকুরদের আতঙ্ক তার অনেক কমল। সে যে সেধে বড়ো কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে যায় তা মোটেই নয়। তবে সে জানাতে চায়, সেও আছে তার নিজের অধিকারে। তাকে ঘাঁটাতে এসো না।

সমবয়সী কুকুরবাচ্চারা বড়ো কুকুর দেখলে যেমন পালায়, তেমনি লুকোয় তাকে দেখলেও। ছোট বড়ো দুইএর মাঝখানে সে তার গর্বিত গোঁ নিয়ে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাকে চায় না, সেও চায়না কাউকে।

গরমের মাঝামাঝি এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তার হোলো। শিকারীদের সঙ্গে হরিণ শিকারে সে গিয়েছিল জঙ্গলে, ইতিমধ্যে গ্রামের একধারে একটা নতুন তাঁবু উঠেছে। একলা একলা সেই তাঁবুটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল কিচের। তার মা—এই না তার সেই হারানো মা? পুরোনো দিনের মতো দাঁত বার করে তেড়ে এল কিচে। ঠিক তো, সত্যিই তো মা! এক মুহূর্তে সে যেন শিশু হয়ে গেল, বুক ভরে গেল আত্ম-নিবেদনের কারুণ্যে। মানুষ-প্রভুদের যতোদিন সে দেখেনি, ততোদিন তার চেতনা জুড়ে মা ছাড়া আর কেউ তো ছিল না! মা-হারা হয়ে কতোদিন সে কেঁদেছে! আনন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগে সে ছুটে গেল মা-র কাছে,—আর একটি নিশ্চিত কামড়ে কিচে তার গালে এঁকে দিল গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন।

পিছিয়ে এল ফ্যাঙ যন্ত্রণার চমকে। এ কী হোলো? নেকড়ে-মা ভুলে গেছে তার একবছর-বয়সী সন্তানকে। মনে রাখা তার ধর্ম নয়। তার কোল জুড়ে তখন এক পাল নতুন বাচ্চা। হোয়াইট ফ্যাঙ অবাঞ্ছিত আগন্তুক।

ক্ষুদে একটা বাচ্চা হোয়াইট ফ্যাঙের কাছে দৌড়ে এল। আহা, তার সৎভাই। হোয়াইট ফ্যাঙ উৎসুক নাক বাড়িয়ে সেটাকে একবার শুঁকতেই আবার তেড়ে এল কিচে, ঘা বসাল তার আর-একটা গালে। আরো কিছুটা হটে গেল ফ্যাঙ। মাকে ঘিরে তার যতো সুখস্মৃতি মন্থিত হয়ে উঠেছিল সব তলিয়ে গেল অতলে। কিচের দিকে সে চাইল, কিচে তখন নতুন বাচ্চাটাকে চাটছে আর মুখ দিয়ে বার করছে গর্ গর্ ভয়-দেখানো আওয়াজ। ও কেউ না, কেউ না। ওকে ছেড়ে থাকতে সে শিখে গেছে। এখন ওর কোনো দাম নেই। ও তো তাকে চায় না, ওরও কোনো জায়গা নেই তার জীবনে।

তৃতীয়বার তাকে আক্রমণ করল কিচে।

হোয়াইট ফ্যাঙ সরে গেল। বাধা দিল না, লড়াই করল না সে কিচের সঙ্গে। ও তার মা বলে নয়, ও মাদী বলে। সে কেমন করে ঠিক জানে যে মাদীর সঙ্গে মদ্দা লড়েনা—নেকড়ে-জাতের এই নিয়ম।

তৃতীয় বছরে যখন ফ্যাঙ পা দিয়েছে, ম্যাকেঞ্জি নদীতীরের ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত বসবাস জুড়ে নামল দারুণ দুর্ভিক্ষ। গরমকালেই মাছের অজন্মা, শীত পড়তে না পড়তেই সারা চারণ-ভূমি থেকে অদৃশ্য হোলো ক্যারিব্যু হরিণের দল। বুনো হরিণ কেন, খরগোসেরও দেখা মেলেনা। শিকারী জন্তুগুলো পর্যন্ত একে অপরকে খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নিঃশেষ হয়ে গেল। জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বলবান তারাই কোনোরকম টিকে রইল কিছুদিন।

হোয়াইট ফ্যাঙের মানুষ-দেবতারাও প্রধানত শিকারজীবী। তাদের মধ্যেও যারা বৃদ্ধ ও দুর্বল, তারা একে একে মরতে লাগল খিদের জ্বালায়। কান্নার রোল উঠল ঘরে ঘরে, মেয়েরা আর শিশুরা শুধু

উপোস করতে লাগল শেষ খাদ্যটুকু শিকারী সমর্থ পুরুষদের জোগান দিয়ে। পুরুষগুলো পাগলের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে লাগল শিকারের ব্যর্থ অন্বেষণে।

হাহাকারের আর শেষ রইল না। মানুষে খেল পায়ের জুতো আর হাতের দস্তানা, কুকুরগুলো চিবিয়ে সাফ করল তাদের বগলস আর চাবুকের চামড়া। দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ কুকুরগুলো গেল মানুষ আর কুকুর উভয়েরই পেটে। যে কুকুরগুলো পার পেল তারা বুঝল দিন ঘনিয়ে এসেছে তাদেরও। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর শক্তি যাদের সবচেয়ে বেশি তারা মানুষ-প্রভুদের নিবন্ত আগুনের আশ্রয় ছেড়ে জঙ্গলে পালাল। সেখানে কেউ মরল অনাহারে আর কেউ বা হোলো নেকড়ের খোরাক।

এমনি দুঃসময়ে হোয়াইট ফ্যাঙও বনে পালাল। শৈশবের আরণ্য অভিজ্ঞতা কাজে লাগল তার। ছোট ছোট প্রাণী শিকারের পুরোনো কৌশল আবার সে আয়ত্ব করে নিল। পেটের জ্বালার চঞ্চলতা দমন করে ঘাপটি মেরে স্থাণু হয়ে বসে অপেক্ষা করে করে হঠাৎ বিদ্যুৎ-আক্রমণে কাঠবিড়ালীকে কাবু করা তার কাছে সহজ হয়ে গেল। কিন্তু কাঠবিড়ালীই বা কটা মেলে? মাটিতে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে তার মধ্যে থেকে কাঠ-ইঁদুর শিকার করেও মাঝে মাঝে সে পেট ভরাল। তারই মতো ক্ষিদেয় পাগল আর তারও চেয়ে অনেক ভয়ংকর নেউলের সঙ্গে লড়াই করতেও সে পেছপাও হোলো না।

দুর্ভিক্ষের ভয়ংকরতম দিনে সে কদিন মানুষের আস্তানার কাছে কাছে ঘুরতে লাগল। মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদেরই ফাঁদে আটকানো জন্তু চুরি করে খেতেও সে ইতস্তত করে না। এমনি ফাঁদে জন্তু কদাচিৎ পড়ে;—তবু সে ফাঁদগুলোকে নজরে নজরে রাখে। ক্য।-দিন এমনকি গ্রে বিভারের ফাঁদ থেকেও একটা খরগোস সে চুরি

করে পালাল। গ্রে বিভার ঠিক সেই সময়েই ফাঁদের কাছে আসছিল। আড়াল থেকে সে দেখল তার দেবতার চেহারা শুকিয়ে কংকালের মতো হয়ে গেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে সে এগোচ্ছে।

একদিন হোয়াইট ফ্যাঙ একটা জোয়ান নেকড়ের সামনাসামনি পড়ে গেল। অনাহারে হাড়-পাঁজরা বার করা বীভৎস করুণ চেহারা জানোয়ারটার। খিদের ব্যাকুলতা না থাকলে হোয়াইট ফ্যাঙ সাথী হতো নেকড়েটার, স্বজাতি আত্মীয়ের দলে মিশে হারিয়ে যেত বনের মধ্যে। তার বদলে সে নেকড়েটার সঙ্গে লড়ে গেল। সেটাকে বধ করে পুরলো পেটের মধ্যে।

এমনি দুর্বিপাকের মধ্যেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বৈকি। খিদেয় যখন সে জরজর, ঠিক তেমনি সময় কোন না কোন শিকার তার জুটে যেতই। আবার দুর্বলতায় সে যখন চলৎশক্তিহীন তেমনি সময়ে কেমন করে সে বড়ো-সড়ো শিকারী জন্তুর নজর এড়িয়ে যেত। একবার একটা বনবিড়াল মেরে দুদিন ধরে আরাম করে তার মাংস খাবার পর সে পড়ে গেল একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখোমুখি। দৌড়ে সে নেকড়েগুলোকে হারিয়ে তো দিলই, বৃত্তাকারে ঘুরে দলটার পিছনে এসে তাদেরই একটাকে সে শিকার করেও ফেলল।

ঘুরতে ঘুরতে সে গিয়ে পড়ল তার জন্মভূমি অঞ্চলে। খুঁজে বার করলে তার পুরোনো গুহা। সেখানে আবার দেখা হয়ে গেল কিচের সঙ্গে। সেও তার প্রভুদের এড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুরোনো আবাসে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই আশ্রয়ে পৌছে যে-সব বাচ্চার সে জন্ম দিয়েছে সেগুলো সব মরেছে,—একটি কেবল মরতে বাকি।

সে কিচেকে চিনলেও কিচে তাকে চিনল না। ক্ষুৎপীড়িতা সন্ত-শোকাতুরা মা তেড়ে গেল বুড়ো ছেলেকে মারতে। হোয়াইট ফ্যাঙ

আর ছোটটি নয়, মা-র প্রয়োজন কবেই না তার ফুরিয়েছে! সরে পড়ল সে সেখান থেকে। নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে সেই বনবিড়ালের গর্তটা খুঁজে পেল, যাকে ছেলেবেলায় মা-র সঙ্গে সে মেরেছিল। পুরোনো দিনের শত্রুর এই আস্তানায় একটা দিন সে কাটাল।

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তার দেখা হোলো লিপ-লিপের সঙ্গে। লিপ-লিপও বনে পালিয়ে দুর্ভাগ্যের দিন কাটাচ্ছে। একটা উঁচু টিবির গা ঘেঁসে যেতে যেতে সে হঠাৎ দেখে একেবারে সামনে মুখোমুখি লিপ-লিপ,—তার চিরশত্রু। থমকে দাঁড়াল দুজনেই—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগল একে অপরকে।

এর আগে পূরো একটা সপ্তাহ ধরে হোয়াইট ফ্যাঙের শিকার জুটেছে ভালো—খেয়েছে সে পেট পূরে। শরীরে ক্লান্তি নেই. দুর্বলতা নেই। লিপ-লিপকে দেখামাত্র তার পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল—দাঁত বার করে গর্জন করে উঠল সে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। লিপ-লিপ পিছু হটবার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ। এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে একটি মাত্র কামড়ে ফ্যাঙ তার গলার নলীটা ছিঁড়ে ফেলল। ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে লিপ-লিপ যতোক্ষণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, ততোক্ষণ পরম আত্মপ্রসাদে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। তারপর শত্রুবিনাশের পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে সে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আবার চলতে সুরু করল।

এর কিছুদিন পরে সে আবার এসে পৌছল জঙ্গলের কিনারে ম্যাকেঞ্জি নদীর তীরে। এখানে সে আগেও এসেছে। তখন ছিল

ফাঁকা জমি, এখন গজিয়েছে তাঁবু-ঘেরা গ্রাম। গাছপালার পিছনে আত্মগোপন করে সে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ,—সবই যেন চেনা চেনা। নতুন এলাকায় এ তো সেই পুরোনো জনপদ। কিন্তু বদলেছেও অনেক। কেউ কাঁদছে না ক্ষুধার জ্বালায়, মৃত্যুর শোকে। একটি স্ত্রীলোক চিৎকার করে কাকে বকছে—এমন চিৎকার ভরা-পেটেই সম্ভব। গন্ধ আসছে খাবারের,—টাটকা মাছের। না, ভুল নেই। উধাও হয়েছে দুর্ভিক্ষ। সাহসে বুক ফুলিয়ে এগোল ফ্যাঙ, সোজা এসে পৌঁছল গ্রে বিভারের তাঁবুর সামনে। গ্রে বিভার তাঁবুতে ছিল না। ক্লু-কুচ তাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, মুখের সামনে ধরল সবে-মাত্র ধরা পূরো একটা ইয়া বড়ো মাছ। ভরপেট খেয়ে তাঁবুর দোরগোড়ায় আরামে পা টান্ টান্ করে শুয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ অপেক্ষা করতে লাগল, কখন প্রভু আসবে।

শয়তানের ভর

শিক্ষানবিশ

হোয়াইট ফ্যাঙের বয়স তখন পাঁচ বছর। গ্রে বিভার এবার এক লম্বা পাড়ি দিল তাকে সঙ্গে নিয়ে। ইতিমধ্যে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে ফ্যাঙ—তার জাতের সকল কুকুরের সে শত্রু। কুকুরই হোক আর নেকড়েই হোক, মানুষের হাতে পোষ মেনে মানুষের আশ্রয়ে থেকে মতিগতি বদলাবেই। মানুষের শক্তির ছায়ায় ছায়ায় তার শক্তি কমবে, মানুষের তৈরি আগুনের উত্তাপে উত্তাপে গলে নরম হবে তার মেজাজ। হোয়াইট ফ্যাঙ দমবার নয়, নরম হবার নয়। তার বন্য বর্বরতা গ্রে বিভারের মতো বর্বরেরও চমক লাগিয়ে দেয়। এমন কুকুর কখনো সে দেখেনি। তার লড়াইয়ের ক্ষমতার কথা ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে—এমন কুকুর তারাও কেউ কখনো দেখেনি। ম্যাকেঞ্জি নদীর তীর ধরে রকি পাহাড়শ্রেণী পার হয়ে পর্কুপাইন নদীর ধারে পৌঁছে সেখান থেকে ইউকন নদীর ধার পর্যন্ত গ্রে বিভার চলল। পথে গ্রামে গ্রামে কুকুরদের সঙ্গে লড়াই করে কতো কুকুরের ভবলীলা যে হোয়াইট ফ্যাঙ সাঙ্গ করল তার ইয়ত্তা নেই। সে যেন চলেছে দিগ্বিজয় করতে। কোনো কুকুর তার সঙ্গে পারে না। লড়াই সুরু হতে না হতেই সে পলকে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মৃত্যুর বিদ্যুৎ-আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর গলার নলী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার হাতে যে মরে, সে মরবার আগে আশ্চর্য হবার ফুরসৎটুকুও পায় না।

হোয়াইট ফ্যাঙের লড়াইএর রীতিই অন্য সব কুকুরের থেকে আলাদা। সে কখনো বৃথা ছটফট করে না, অযথা শক্তির অপব্যয়

করার পাত্রই 'সে নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জড়াজড়ি করতে সে নারাজ, শত্রুর গায়ে গায়ে লেগে থাকতে তার সব চেয়ে অপছন্দ। বিদ্যুতের গতিতে সে আঘাত হানে, দাঁতের কামড় একবার যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, এক লাফে সরে গিয়ে আবার আক্রমণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী জাপটে ধরলে সে সহ্য করতে পারে না,—সে স্বাধীন, খাড়া পায়ে সে দাঁড়াতে চায়। জড়াজড়ি মানেই বিপদ, জড়িয়ে ফেলার ফাঁদ। ফাঁদকে এড়ানোর প্রবৃত্তি আছে তার আদিম বন্ধ রক্তে।

তাই তার সঙ্গে পেরে ওঠা অন্য কোনো কুকুরের পক্ষে অসম্ভব। তাদের লড়াইএর কায়দা প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঁকড়ে ধরে। হোয়াইট ফ্যাঙ কিছুতেই সেই ফাঁদে পা দেবে না। সে করবে মুহূর্তের আক্রমণ, আবার ছিটকে দূরে সরে যাবে। দু-একবার অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে আক্রমণ করে তাকে শাস্তি দিয়েছে, একলা প্রতিদ্বন্দ্বীর কামড় কখনো সে খায়নি এমনও নয়। কিন্তু এ সব দুর্ঘটনা। লড়াইএর সবচেয়ে আশ্চর্য গুণটি তার রপ্ত হয়েছে,—কী করে শত্রুর প্রতিটি আঘাত এড়িয়ে যেতে হয়, আর কী করে একটি মাত্র নিশ্চিত আঘাতে শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়।

এছাড়া সময় আর দূরত্বের জ্ঞান তার মতো কোনো কুকুরের নয়। চোখের সঙ্গে বুদ্ধি আর বুদ্ধির সঙ্গে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন এক সূত্রে বাঁধা। এমনটি আর অন্য কোনো কুকুরের সম্ভব নয়। তাই শত্রু যখন তার দিকে লাফ মারে তখন চট্ করে সে যেমন সরতে পারে, তেমনি পারে কাল-বিলম্ব না করে সেই মুহূর্তেই উল্টে শত্রুকে মরণ-আঘাত হানতে। তার মস্তিষ্ক আর শরীর যন্ত্রের মতো একসঙ্গে কাজ করে। এক সেকেণ্ডের জন্তেও একে অপরের পেছনে পড়ে থাকে না। সাধারণ

কুকুরের মতো সে নয়, প্রকৃতি তাকে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে— তাকে বানিয়েছে লড়িয়ে-কুকুরদের রাজা।

গ্রীষ্মকালে হোয়াইট ফ্যাঙ ফোর্ট ইউকনে পৌছল। ম্যাকেঞ্জি থেকে ইউকন নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল গ্রে বিভার অতিক্রম করল শীতের শেষ ভাগে। বসন্তকালে সে শিকার করে কাটাল রকি পর্বতমালার পশ্চিম এলাকায়। পর্কুপাইন নদীর বরফ যখন গলল, তখন সে গাছ কেটে নৌকো বানিয়ে নদীপথে গিয়ে পৌছল আর্টিক বৃত্তের ঠিক দক্ষিণে পর্কুপাইন ও ইউকন নদীর সঙ্গমে। এখানে হাডসন বে কোম্পানীর পুরোনো কেল্লা ফোর্ট ইউকন। এখানে প্রচুর হৈ চৈ। দলে দলে ইণ্ডিয়ানরা জড়ো হয়েছে, উত্তেজনার শেষ নেই। শত শত লোক এখান দিয়ে চলেছে সোনা আবিষ্কারের লোভে ডসন ও ক্লনডাইকের দিকে। পথ এখনো কয়েকশো মাইল বাকি। কিন্তু হাজার হাজার মাইল পথ এরই মধ্যে বছরের পর বছরের ভ্রমণে অতিক্রম করে দুঃসাহসী স্বর্ণসন্ধানীর দল চলেছে। অনেকে আবার এসেছে সমুদ্রপার থেকে। ফোর্ট ইউকন এই অভিযাত্রীদের একটা বড়ো রকমের সাময়িক আস্তানা।

গ্রে বিভারের কানেও এ খবর গিয়েছিল, নইলে এত দূরের পাড়ি সে জমাতো না। গাঁট বোঝাই করে সে সঙ্গে এনেছিল লোমের কাপড়, হরিণের চামড়ায় জুতো আর দস্তানা। ভেবেছিল এ সব বেচে টাকায় টাকা লাভ করবে। দেখল বাজার গনগনে গরম, একটাকায় লাভ দশ টাকা। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত ফোর্ট ইউকনে বসে বসে সে ফলাও ব্যবসা চালাল।

এই ফোর্ট ইউকনে হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথম দেখল সাদা মানুষ। তার মনে হোলো রেড ইণ্ডিয়ানদের তুলনায় সাদা মানুষরা যেন

অন্য জাত :—দেবতা তো বটেই, অনেক উচুদরের দেবতা। এ দেবতাদের ক্ষমতা অনেক বেশি—এরাই তো দেবতাদের রাজা। বস্তুর ওপর এদের প্রবল প্রতাপ। বিরাট বিরাট পাকা বাড়ি এরা বানিয়েছে – জলপথে এরা নৌকোয় চলে না,—সাগর পার হয় বাড়ির মতো বড়ো বড়ো জাহাজে। এই সাদা-চামড়ার দেবতাদের কাছে তার প্রভু গ্রে বিভার তো শিশু!

এই সব উচুদরের দেবতাদের ভয় করতে হবে, সন্দেহ করতে হবে আরো বেশি। এত এদের শক্তি, না জানি এদের হাতের শাস্তি হবে কতো ভয়ংকর! দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে এদের লক্ষ্য করল হোয়াইট ফ্যাঙ। না, ভয় কী? কতো কুকুর তো এদের কাছে যাচ্ছে! বিপদ ঘটছে না তো তাদের? সাহস করে হোয়াইট ফ্যাঙ পা বাড়াল।

সাদা মানুষরাও তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। এ আবার কেমনধারা কুকুর? আধা-কুকুর আধা-নেকড়ে কিম্ভুত জানোয়ারটার দিকে তারা আঙুল বাড়িয়ে দেখায়,—এতে হোয়াইট ফ্যাঙের আতংক আর সন্দেহ বাড়ে। তার দিকে কেউ এগোলে সে দাঁত বার করে পিছু হটে। তাকে যে তারা কেউ ছুঁতে পারে না এতে সেও তুষ্ট আর তাদেরও মঙ্গল।

ফোর্ট ইউকনে সাদা-চামড়ার স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দু-তিন দিন অন্তর এখানে জাহাজ এসে থামে, তখন নামা-ওঠা করে বহু সাদা লোক,—অগুনতি যাত্রীর ভিড়।

সাদা দেবতারা দেবতাদের রাজা হতে পারে কিন্তু তাদের কুকুরগুলো কিচ্ছু না। সাদা প্রভুদের সঙ্গে অগুনতি কুকুরও জাহাজে করে আসে। নানা রকম এদের চেহারা, কোনোটা বড়ো কোনোটা ছোট, কোনোটার লম্বা লম্বা সরু সরু পা, আবার কোনোটা এত বেঁটে

যে মাটিতে পেট ঠেকে গেল বলে। গায়ে এদের ঝাঁকড়া লোম নেই, আছে অল্প অল্প চুল। আর লড়াই করতে এদের মধ্যে কেউ জানেনা।

আপন জাতের চিরশত্রু হোয়াইট ফ্যাঙ। এই সাদা প্রভুদের কুকুরগুলোকে সে ঘৃণাই করে। এরা অশক্ত কাপুরুষ, এদের তর্জন-গর্জন আর নাচন-কোঁদনই সার। ফ্যাঙকে দেখলেই এরা তেড়ে আসে, এক ঝলকে সে পাশে সরে যায়। কী হোলো বোঝবার আগেই হোয়াইট ফ্যাঙ এক এক ধাক্কায় এক একটাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে, তারপর গলার নলীতে অব্যর্থ কামড় লাগায়।

হোয়াইট ফ্যাঙের আঘাতে কোনো নতুন কুকুর মাটিতে লুটিয়ে পড়ামাত্র ইণ্ডিয়ানদের অন্য কুকুরগুলো তেড়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে। হোয়াইট ফ্যাঙ বুদ্ধিমান। সে জানে মরা কুকুরের প্রভু চটে আগুন হবেই। তাই সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে তার গলাটা ছিঁড়ে ফেলেই খুসি। অন্য কুকুররা যখন সেটাকে কামড়ে কামড়ে ছেঁড়ে, সেই দলবদ্ধ বীভৎসার মধ্যে সে যায় না। আর ঠিক সেই সময়েই সাদা প্রভুরা ছুটে এসে ঢিল লাঠি কুঠারের আঘাতে কুকুর-গুলোর ওপর আক্রোশ মিটোয়। হোয়াইট ফ্যাঙের টিকিও মেলে না সে সময়ে। একদিন তো একজন সাদা মানুষ চোখের সামনে তার প্রিয় কুকুরের দুর্দশা দেখে প্রতিহিংসায় আগুন হয়ে উঠল, কোমর থেকে রিভলভার খুলে আক্রমণ করল কুকুরের দলকে। পর পর ছটা গুলি, ছটা কুকুর মরল। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙের গায়ে আঁচড়টি লাগল না। সে তখন তল্লাট ছেড়েই হাওয়া। অনেক দূর থেকে সে দেখল সাদা মানুষের কী অদ্ভুত ক্ষমতা! এই ঘটনা তার স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে রইল।

হোয়াইট ফ্যাঙের একবিন্দুও দুঃখ নেই— সাদা দেবতাদের কুকুরই মরুক আর নিজের দলের কুকুরই মরুক। আত্মরক্ষার প্রখর

সে বলীয়ান। গ্রে বিভার মাসের প[illegible]

জমাচ্ছে। হোয়াইট ফ্যাঙের কোন কাজ [illegible] বাস করত তারা সংখ্যায় বিভিন্ন জাহাজের সাদা মানুষদের নানা বিজ্ঞ[illegible] হয়ে যাওয়া আসা লড়াই করে তাদের ঘায়েল করা। নিজের জাতের কু[illegible] হোতোনা। তার কোনো মিতালি নেই। তাদের সঙ্গে সে মেশেনা। ত[illegible] সিন্দারা যমের মতো ভয় করে। বিদেশী কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়াটা গোড়া[illegible] সে বাধায়, তাদের কাবু করে গলায় মরণ-কামড়টা লাগায় সে-ই। তারপর যখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে তার জাতের কুকুররা ছেঁড়াছেড়ি করে তখন সে গর্বিত ঔদাসীন্যে দলছাড়া হয়ে যায়,—দেখে কখন্ সাদা প্রভুরা এসে এগুলোকে ঠ্যাঙাবে।

আগন্তুক কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেও তার অসুবিধে নেই। তাকে কিছু করতে হয় না, বোকা কুকুরগুলোই তার পিছনে লাগে। তাকে একবার দেখলেই হোলো, অমনি ওরা ছুটে আসে ঝগড়া বাধাতে। এরা ওদের কুকুর-জাতের সহজাত অনুভূতি থেকেই যেন বুঝতে পারে—এটা বন্য। যুগযুগান্ত আগে আদিম পৃথিবীর আরণ্যক অন্ধকার এড়িয়ে ওদের পূর্বপুরুষ আশ্রয় নিয়েছিল মানুষের হাতে জ্বালা আগুনের আশেপাশে,—অরণ্যের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাই বন্যতার প্রতি সহজাত আতংক চিরকাল তাদের বংশধরদের রক্তে বাসা বেঁধে আছে। অরণ্যের বিরুদ্ধে মানুষ-প্রভুদের যে জন্মজন্মান্তরের লড়াই, এই লড়াইতে বংশপরম্পরায় এরাও অংশীদার। যা বন্য, তাকে আক্রমণ করা এদের সহজাত প্রবৃত্তি।

পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চল থেকে আগন্তুক নাগরিক কুকুর তাই হোয়াইট ফ্যাঙের বন্য চেহারা দেখলেই চমকে ওঠে, তাকে আক্রমণ করার অনিবার্য আগ্রহ বাধা মানেনা। এরা সহুরে কুকুর আর হোয়াইট ফ্যাঙ বনের। এদের সহুরে পূর্বপুরুষদের চোখ দিয়ে বুনো ফ্যাঙের

যে মাটিতে পেট ঠেকে গেল বুঝে এটা নেকড়ে, কুকুরের জাতশত্রু আছে অল্প অল্প চুল। একবার।

আপন জাতের তাতে ক্ষোভ নেই, বরং ফুর্তি। এরা ভাবে সে কুকুরগুলোকে ফ্যাঙ জানে তার শিকার এরা।

গর্জন উঁর সঙ্গে পারবে কে? ঐ সহুরে দুর্বল কাপুরুষের দলের কাছে তাকে হার মানতে হয় তাহলে বৃথাই তার চোখ ফুটেছে অগম্য অরণ্যের গুহায়, মায়ের বুকের দুধ ছাড়তে না ছাড়তে বৃথাই সে লড়াই করেছে বন-মুরগী, বন-বিড়াল আর বন-নেউলের সঙ্গে। বৃথাই তার বাল্যের প্রতিটি মুহূর্ত লিপ্‌-লিপ আর তার দলের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারে অত্যাচারে হয়েছে তিক্ত বিষময়। লিপ-লিপ যদি না থাকত, তাহলে হয়তো সে কুকুর-বাচ্চা হয়েই বড়ো হোতো, আসলে যে-জাতের সে অন্যতম সেই সারা কুকুর জাতের সারা জীবনের মতো শত্রু হয়ে উঠত না সে। গ্রে বিভারের আচারে ব্যবহারেও যদি বিন্দুমাত্র স্নেহমাধুর্যের স্পর্শ থাকত, তাহলে হয়তো ফ্যাঙ শিখত আদিম নিষ্ঠুরতা পরিহার করতে,—সহজ হতে, নম্র হতে। কিন্তু তা তো হয়নি। যা ছিল কাদার তাল, তা দিনে দিনে গড়ে উঠেছে বজ্রকঠিন হয়ে। তাই হোয়াইট ফ্যাঙ নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ সে, ভয়াল সে। কেউ তার বন্ধু নয়,—তার জাতের সকল প্রাণীর সঙ্গে তার প্রতি মুহূর্তের ক্ষমাহীন শত্রুতা।

বিউটি স্মিথ

ফোর্ট ইউকনে স্থায়ীভাবে যে-সব সাদা মানুষ বসবাস করত তারা সংখ্যায় খুবই কম। যে-সব সাদা মানুষের দল ফোর্ট ইউকন হয়ে যাওয়া আসা করত তাদের সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দাদের বনিবনা বিশেষ হোতোনা। বরং এই সব আগন্তুকরা যদি কোনো রকম বিপদে পড়ত স্থায়ী বাসিন্দারা তাতে আমোদই পেত। ফ্যাং আর তার বুনো কুকুরের দলবল আগন্তুকদের কুকুরগুলোকে ধরে ধরে যে ভাবে শেষ করত তা লক্ষ্য করে স্থায়ী বাসিন্দাদের কৌতুক দেখে কে? ঘাটে জাহাজ এলেই তারা এসে দাঁড়াত দিশি কুকুরদের সমান উৎসাহ নিয়ে। সব চেয়ে মজা তারা পেত হোয়াইট ফ্যাঙের ক্ষমতা আর বুদ্ধি দেখে।

কুকুরদের লড়াই দেখে খুসিতে একেবারে ক্ষেপে উঠত, এমনি ছিল একটা লোক। জাহাজের ভোঁ শুনলেই সে সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসত ঘাটে। হোয়াইট ফ্যাঙ যখন বিদেশী কুকুরদের ঘায়েল করত, অন্য দেশী কুকুররা যখন তাদের বুকে চেপে তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ত, তখন পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ত লোকটা,—মাথার ওপর দু-হাত তুলে লাফাত। দুঃখ হোতো তার তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ হলে। হোয়াইট ফ্যাঙের ওপর লোভী নজর ছিল লোকটার।

সবাই তাকে ডাকত বিউটি স্মিথ বলে। তার আসল নাম কেউ জানত না। এত কুৎসিত ছিল তার চেহারা যে ফোর্টের বাসিন্দারা ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছিল বিউটি, সারা তল্লাটে তার এই বিউটি নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল। তার মতো বীভৎস জঘন্য চেহারার লোক আর একটা পাওয়া ভার। চেহারা তার জীর্ণ শীর্ণ বেঁটে খাটো, সরু লিক্‌লিকে শরীরের প্রান্তে সরু

একটা মাথা। পিছন দিকে মাথাটা নির্ভাজভাবে নেমেছে ঘাড় পর্যন্ত, আর সামনের দিকে ভ্রুর ওপর ঝুলে পড়া মস্ত একটা কপাল। মাথাটা সরু হলে কী হয়, লোকটার কপাল যেমন মাঠের মতো তেমনি ভাঁটার মতো গোল গোল দুটো চোখ। বিশাল একটা হাঁ আর ভারি চিবুকটা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে বুক বরাবর। শীর্ণ ঘাড়টা এত বড়ো থুতনিটার ভার যেন বইতে না পেরে শিরদাঁড়াটা পর্যন্ত কুঁজো করে দিয়েছে।

সিংদরজার মতো চোয়ালটা দেখলে মনে হয় বুঝি সে একটা দৃঢ়-চরিত্রের লোক। কিন্তু আসলে সেটা ধোঁকা। সবাই জানে বিউটি স্মিথের মতো দুর্বলচিত্ত মিনমিনে কাপুরুষ আর হয় না। শুকনো ঠোঁটের দু-পাশ থেকে গজালের মতো এক জোড়া দাঁত বার হয়ে থাকলে কী হয়, চোখ দুটো তার কাদার মতো বর্ণহীন। তেমনি পচা শ্যাওলার মতো ফিকে হলুদ রঙের নোংরা গুচ্ছ গুচ্ছ চুল তার মুখে মাথায় এবড়ো খেবড়ো হয়ে গজিয়েছে।

ফোর্ট ইউকনের বাসিন্দাদের রান্না করে এই কদর্য লোকটা। সবাই তাকে সহ্য করে, কিছুটা ভয়ও পায়। বলা যায় না, কোন্‌দিন যদি বিষ মিশিয়ে দেয় খাবারে! অমন লোক সবই পারে। তবে অকর্মাটা করবেই বা কী? রান্নাই করুক।

হোয়াইট ফ্যাঙের অকুতোভয় বীর্য দেখে দেখে এই লোকটা লোভে মরে, ভাবে, কুকুরটা যদি তার হোতো! প্রথম দিন থেকেই সে ফ্যাঙের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। প্রথম প্রথম ফ্যাঙ তাকে আমল দিত না, তারপর স্মিথ লোকটা যখন আদরের বাড়াবাড়ি সুরু করল, তখন হোয়াইট ফ্যাঙ তাকে এড়াতে লাগল দাঁত বার করে ভয় দেখিয়ে। লোকটাকে সে আদপেই পছন্দ করে না—ও যখন হাত বাড়িয়ে আদর করতে চায়, মিষ্টি কথায় তাকে ডাকে, সে ঘৃণায় শিউরে ওঠে।

হোয়াইট ফ্যাঙ তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে,—লোকটা খারাপ। ওর বীভৎস দেহ আর নোংরা মন থেকে যেন অস্বস্থ পূতিগন্ধ উঠছে। তার মনের গভীর কন্দর থেকে কোন্ সুগুপ্ত ধারণা যেন তাকে সাবধান করে দেয়,—ও লোকটার মধ্যে সয়তান আছে, ও অত্যাচারের প্রতীক, ঘৃণা ওকে করতেই হবে।

বিউটি স্মিথ প্রথম যেদিন গ্রে বিভারের তাঁবুতে পা দিল সেদিন তাঁবুতে ফ্যাঙও ছিল। চোখে দেখার আগে দূর থেকে তার পায়ের শব্দ শুনেই ফ্যাঙের গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আরামে সে শুয়ে ছিল, কিন্তু লোকটা ঢুকতেই সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁবুর এক কোনে সরে গেল। গ্রে বিভার আর বিউটি স্মিথ কথা বলতে লাগল। কী কথা ওরা বলছে সে বুঝতে পারল না, কিন্তু কথার মধ্যে বিউটি স্মিথ তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই সে গর্ গর্ করে উঠল। হেসে উঠল বিউটি স্মিথ, সে বিতৃষ্ণায় তাঁবু থেকে বেরিয়ে কাছের জঙ্গলে গিয়ে বসে রইল।

বিউটি স্মিথের প্রস্তাবে রাজি হোলো না গ্রে বিভার,—ফ্যাঙকে সে বেচবে না। ব্যবসা করে সে ফেঁপে উঠেছে—টাকার কেয়ার সে করে না। হোয়াইট ফ্যাঙ দামী কুকুর,—তার স্লেজটানার কুকুরের দলের নেতা। তাছাড়া ম্যাকেঞ্জি থেকে ইউকন পর্যন্ত কোথাও তার মতো লড়িয়ে কুকুর জুটি নেই। মানুষ যেমন মশা মারে, তেমনি সে মারে অন্য কুকুরদের। বিউটি স্মিথের জিভ দিয়ে যতো জলই ঝরুক,—হোয়াইট ফ্যাঙকে পয়সার বিনিময়ে সে ছাড়বে না।

বিউটি স্মিথ কিন্তু জানত রেড ইণ্ডিয়ানদের কী করে হাতের মুঠোয় আনতে হয়। রোজই সে গ্রে বিভারের তাঁবুতে আসতে আরম্ভ করল—রোজই জামার তলায় লুকোনো এক এক বোতল কড়া মদ। নেশা জমে উঠল গ্রে বিভারের, ক্রমে তৃষ্ণাটা তার আর কিছুতেই মেটে না। রক্তে তার আগুন লাগল, পুড়ে গেল পাকস্থলী—একমাত্র জ্বালাময়ী মদের

নেশাতেই এ আগুন সে নেবাতে পারে। মদ তার চাই-ই চাই,—যতো-দিন যায় আরো চাই,—তার জন্তে যা লাগে লাগুক। পশুর লোম, চামড়ার জুতো আর দস্তানা বিক্রী করে যতো পয়সা সে করেছিল, সব উড়ে যেতে লাগল। টাকার থলির ওজন যতো কমে, ততো ক্ষেপে ওঠে তার মেজাজ।

অবশেষে টাকা আর মালপত্র সবই তার ঘুচল। ঠাণ্ডা হয়ে এল মেজাজ। সব গেছে,—আছে স্বধু প্রবল তৃষ্ণা। এমনি সময়ে বিউটি স্মিথ আবার কথাটা পাড়ল। দাম কিন্তু এবার পয়সা দিয়ে নয়, বোতল দিয়ে। এই প্রস্তাব শোনবার জন্তেই বুঝি বোকা রেড ইণ্ডিয়ানটা কান খাড়া করে ছিল। বোতলগুলো গুনে নিয়ে সে জড়িত কণ্ঠে বললে,—ধরতে পারো তো নিয়ে যাও তুমি ওটাকে।

দুদিন চেষ্টার পরে বিউটি স্মিথ বললে গ্রে বিভারকে,—ধরে দাও তুমি, তবে না?

হোয়াইট ফ্যাঙ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, রাত্রের অন্ধকারে কেবল তাঁবুতে এসে ঢোকে। সে বুঝেছে, ভয়ানক বিপদ একটা কোথা থেকে আসছে। একদিন রাত্রে হোয়াইট ফ্যাঙ সবে মাত্র তাঁবুতে ফিরে পা ছড়িয়ে শুয়েছে, গ্রে বিভার টলতে টলতে তার কাছে এল। তার গলায় চামড়ার একটা মোটা রশি পরিয়ে এক হাতে রশিটা ধরে তার পাশে সে এসে বসল। অন্য হাতে মদের বোতল। বোতলটা তুলে মাঝে মাঝে সে ঢক ঢক করে মদ খেতে লাগল।

দূর থেকে চেনা পায়ের শব্দ শুনে লোম খাড়া করে উঠল ফ্যাঙ। আস্তে টান দিল চামড়ার রশিতে, গ্রে বিভার আরো শক্ত মুঠিতে সেটা ধরে রইল। বিউটি স্মিথ তাঁবুতে ঢুকে তাদের সামনে দাঁড়াল।

সে দেখল তার দিকে হাত বাড়িয়েছে বিউটি। ভয়ে ঘৃণায় তার মুখ থেকে গর্ গর্ আওয়াজ বার হতে লাগল। হাতটা কাছে আসতেই সে

লাফিয়ে উঠল দাঁত-বার করে। গ্রে বিভার তার মুখে মারল একটা ঘুসি, বেদনায় বশ্যতায় সে মাটিতে মুখ নিচু করল।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখল বিউটি স্মিথ তাঁবুর বাইরে গিয়ে একটা মোটা লাঠি নিয়ে এল। চামড়ার বেল্টের একটা দিক গ্রে বিভার তুলে দিল বিউটি স্মিথের হাতে। বিউটি তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। সে নড়বে না, তাই গ্রে বিভার তাকে ঘুসির পর ঘুসি মারতে লাগল। হঠাৎ সে খাড়া হয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিউটির ওপর। লোকটা কিন্তু পালাল না। লাঠিটা তুলে এমন ভয়ংকর একটা ঘা লাগাল তার মাথায় যে ফ্যাং লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। গ্রে বিভার তারিফ করল এই মারের। বিউটি স্মিথ আবার রশিতে টান দিল। বেদনায় বিভ্রান্ত ফ্যাং আস্তে আস্তে চার পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। আর সে আক্রমণ করল না। লাঠির একটা ঘা খেয়েই সে বুঝেছে,—এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। নিরুপায় অনিচ্ছায় সে পায়ে পায়ে চলল বিউটি স্মিথের পিছু পিছু। বিউটি স্মিথ তার ওপর কড়া নজর রেখে লাঠি উঁচিয়ে হাঁটতে লাগল।

ফোর্টে পৌঁছে বিউটি স্মিথ হোয়াইট ফ্যাংকে আচ্ছা শক্ত করে বেঁধে রেখে ঘুমোতে গেল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল ফ্যাং। তারপর সে চামড়ার রশিতে দাঁত লাগিয়ে দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটাকে পরিষ্কার দু-টুকরো করে ফেলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাগে খানিকটা গোঁ গোঁ করার পর সে যাত্রা করল গ্রে বিভারের তাঁবুর উদ্দেশে। এই বীভৎস কুৎসিত দেবতাটা তার কে? গ্রে বিভারের হাতেই সে তার জীবন সঁপেছে। তার সেই প্রভুরই দাসত্ব সে করবে, আর কারো না।

গ্রে বিভার কিন্তু আবার তাকে চামড়া দিয়ে বাঁধল, সকাল হতে না হতেই সঁপে দিল বিউটি স্মিথের হাতে। বিউটি স্মিথ তাকে শাসন করল, —নতুন রকমের শাসন। আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, আত্মরক্ষার কোনো উপায়

নেই ;—লাঠির পর লাঠি, চাবুকের পর চাবুক সমানে পড়ল তার সারা দেহে। এমন মার কখনো সে কল্পনাও করেনি।

আর বিউটি স্মিথের সে কী উৎকট অট্টহাসি। লাঠি সে পিটোচ্ছে তো পিটোচ্ছেই,—চাবুক সে হাঁকাচ্ছে তো হাঁকাচ্ছেই,—নিষ্ফলা হতাশায় নিছক যন্ত্রণায় কুকুরটা গজরাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, আর্তনাদ করে করে উঠছে.— কাপুরুষ নিষ্ঠুরতার উল্লাসে লোকটার চোখ জ্বলছে, জল ঝরছে জিভ দিয়ে। সব মানুষই শক্তি চায়, বিউটি স্মিথও। মানুষের কাছে সে ঘৃণ্য, প্রতিবেশীর পা চেটে অপমান সয়ে তার জীবন কাটে,—তার বিকৃত কুটিল ব্যর্থ মনের সব প্রতিহিংসা সে বিপন্ন নিরীহ জানোয়ারের ওপর চরিতার্থ করে।

হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝেছিল কেন তার এই শাস্তি। হাত বদল হয়েছে সে,—এক প্রভুর হাত থেকে অন্য প্রভুর হাতে। ফোর্ট থেকে পালিয়ে এসে সে নতুন পুরোনো দুই প্রভুর ইচ্ছাই অমান্য করেছে। গ্রে বিভারকে সে যে ভালবাসে তা নয়, ভালোবাসা সে জানে না। কিন্তু গ্রে বিভারের কাছে সে আত্মসমর্পিত। এই আত্মসমর্পণ, প্রভুর প্রতি এই নিষ্ঠা তার জাতের গুণ, তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তো কুকুর যেমন মানুষের বন্ধু তেমন আর কোনো জানোয়ার নয়।

সে রাত্রে বিউটি স্মিথ তাকে বেঁধে রাখল রেড ইণ্ডিয়ানদের কায়দায় চামড়ার দু-টুকরোর মাঝখানে লাঠি বেঁধে। দেবতাকে ছাড়া সোজা কথা নয়,—এমনকি দেবতা পরিত্যাগ করলেও। রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমিয়েছে, হোয়াইট ফ্যাঙ দাঁত বসাল লাঠিতে। শুকনো শক্ত পাকা কাঠ,—আর গলার এত কাছাকাছি বাঁধা যে দাঁতে নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঘাড়ের মাংসপেশীগুলোকে অসম্ভব রকম শক্ত করে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে কোনোরকমে সে লাঠির একটা প্রান্ত দাঁতের ফাঁকে পেল, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আর অবিশ্রান্ত শক্তিতে চিবিয়ে চিবিয়ে সে

শেষ পর্যন্ত লাঠিটা মচকিয়ে ভাঙল। অসম্ভবকে সাধন করল সে। শেষ রাত্রে সে পৌঁছল গ্রে বিভারের তাঁবুতে, লাঠির একটা অংশ তার গলায় ঝুলছে। পালিয়ে যেতেও পারত,—অন্য কোথাও,—দূরে দূরান্তরে। কিন্তু যে মানুষ-প্রভু দু-দুবার তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আবার তার কাছেই সে ফিরে গেল।

গ্রে বিভার আবার তাকে বাঁধল। আবার সঁপে দিল। আবার অমানুষিক প্রহার। প্রহারের পরিশ্রমে ফেণা ঝরতে লাগল বিউটি স্মিথের মুখ দিয়ে। এক পাশে দাঁড়িয়ে নিরাসক্ত চোখে তা দেখতে লাগল গ্রে বিভার। তার কী? কুকুরটা তো আর তার নয় এখন!

এবারের প্রহারের পর আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না হোয়াইট ফ্যাঙের। অন্য কুকুর হলে মরেই যেত। চাবুক ফেলে আধ-ঘণ্টাটাক বিশ্রাম করার পর বিউটি স্মিথ যখন তাকে টেনে নিয়ে চলল, তখন তার কোনো সম্বিত নেই,—কাঁপছে শরীর, টলছে পা, দুচোখে যেন সে কিছু দেখতেই পাচ্ছে না।

এবার বাঁধন পড়ল লোহার শিকলের। কদিন পরে নিঃসম্বল গ্রে বিভার যাত্রা করল ম্যাকেঞ্জিতে,—হাতে নেই কানাকড়ি, মদের নেশা কেটেছে। হোয়াইট ফ্যাঙ পড়ে রইল ফোর্ট ইউকনে তার নতুন প্রভুর কাছে—যে প্রভু পুরোপুরি শয়তান, আর আধাআধি অন্তত উন্মাদ।

শয়তানের সাকরেদ

উন্মাদ দেবতার রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে থাকতে উন্মাদে পরিণত হোলো হোয়াইট ফ্যাঙ। গেটের পিছনদিকে একটা কাঠের খোঁয়াড়ের মধ্যে তাকে বন্দী করে রাখা হোলো। এখানে দিনের পর দিন ছোট বড়ো অসংখ্য অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে তুলতে লাগল বিউটি স্মিথ। পাগল হয়ে উঠতে লাগল সে। বিউটি স্মিথ প্রথমেই টের পেয়েছিল, মানুষের ঠাট্টার হাসি কুকুরটা সইতে পারেনা। তাই যখনই সে ফ্যাঙকে জব্দ করত, সঙ্গে সঙ্গে খল্ খল্ করে হেসে উঠত তার মুখের ওপর, তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে। সেই তিক্ত অপমানকর হাসির শব্দ কানে এলেই রক্ত চড়ে যেত হোয়াইট ফ্যাঙের মাথায়, কোনো জ্ঞান থাকত না,—ক্ষ্যাপা হয়ে উঠত সে।

আগে হোয়াইট ফ্যাঙ ছিল তার জাতের শত্রু—এখন থেকে শত্রু সে সারা দুনিয়ার,—দুর্দান্ত শত্রু। তার ওপর অত্যাচারের শেষ নেই, সীমা নেই নির্দয়তার,—তেমনি সামাহীন বিচারবুদ্ধিহীন তার দুর্দমনীয় ঘৃণা। এই যে লোহার শিকল তাকে বেঁধেছে কাঠের খোঁয়াড় তাকে আটকেছে, ঐ যে মানুষের দল নিষ্ঠুর ঔৎসুক্যে বার বার তাকে এসে দেখ্ছে, ঐ যে কুকুরগুলো খোঁয়াড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে আর তার দিকে চোখ পিট পিট করে তাকায়, আর ঐ যে তার নতুন প্রভু, শয়তান বিউটি স্মিথ;—সকলের প্রতি তীব্র হলাহলে বিষিয়ে-ওঠা তার মন—দুনিয়ার সব কিছুকে সে দেখে নেবে একবার যদি ছাড়া পায়।

বিউটি স্মিথ যে দিনে দিনে হোয়াইট ফ্যাঙকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল, এর পিছনে তার একটা মতলব ছিল বৈকি! একদিন একপাল লোক এসে

তার খোঁয়াড়ের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। লাঠি হাতে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকে বিউটি স্মিথ তার গলা থেকে শিকলটা খুলে দিল। খোঁয়াড় থেকে বিউটি স্মিথ বার হওয়া মাত্র ছাড়া-পাওয়া ফ্যাঙ খোঁয়াড়ের কাঠের দেয়ালে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, বাইরের লোকগুলোকে একবার যদি নাগালের মধ্যে পায়। অপূর্ব ভীষণ তার রূপ। পূরো পাঁচ ফুট সে লম্বা, মাটি থেকে তার কাঁধ আড়াই ফুট উঁচু, ঝাঁকড়া লোমওয়ালা বিরাট শক্ত জবরদস্ত চেহারা। সারা শরীরে এক ফোঁটা অপ্রয়োজনীয় মাংস নেই—শুধু চওড়া হাড় আর বলিষ্ঠ মাংসপেশী। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে।

খোঁয়াড়ের দরজাটা আবার একটু ফাঁক হোলো। থমকে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ। দরজার ফাঁক দিয়ে লোকগুলো বিশালকায় একটা কুকুরকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল। কুকুরটা ম্যাস্‌টিফ জাতের। এতো ভীষণদর্শন আর এত বড়ো চেহারার কুকুর হোয়াইট ফ্যাঙ কখনো দেখেনি। কিন্তু ঘাবড়াল না সে। এই তো পেয়েছে সে তার এতদিনের হিংসার খোরাক—কাঠ নয় লোহা নয়—জ্যান্ত, রক্তমাংসের জানোয়ার। একে সে দেখে নেবে এবার! এক লাফে ম্যাস্‌টিফটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক কামড়ে সে তার সমস্ত কাঁধটা চিরে ফেলল। ম্যাস্‌টিফটা মাথা ঝাড়া দিয়ে ভাঙা গলায় গর্জন করে উঠল, লাফ দিল হোয়াইট ফ্যাঙকে ধরতে। কিন্তু কোথায় হোয়াইট ফ্যাঙ! তার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাল্লা দেয়, এমন ক্ষমতা কার? লাফিয়ে লাফিয়ে সে দৌড়ে আসে, কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে, ধরা দেয় না নিজে, মুহূর্তে মুহূর্তে শত্রুর নাগালের বাইরে সরে পড়ে, পরমুহূর্তে কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন আঘাত হানে।

বাইরের লোকগুলো তখন খুসিতে চেঁচাচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে। তাদের মধ্যে বিউটি স্মিথ হোয়াইট ফ্যাঙের বাহাদুরি দেখে ফেটে পড়ছে

উল্লাসে আর উত্তেজনায়। প্রথম থেকেই ম্যাসটিফটার কোনো আশা ছিল না, যতো বড়োই তার চেহারা হোক না কেন। শেষ পর্যন্ত বিউটি স্মিথ খোঁয়াড়ে ঢুকে লাঠি উঁচিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে সরালো, ম্যাসটিফটার মালিক সেই অবসরে আধমরা কুকুরটাকে টেনে বার করে আনল। দেনা-পাওনা চুকল, ঝনঝন করে টাকা বাজতে লাগল বিউটি স্মিথের হাতে।

এর পর থেকে হোয়াইট ফ্যাঙ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে, কখন তার খোঁয়াড়ের চারদিকে লোকজনের ভিড় জমবে। ভিড় হওয়া মানেই লড়াই একটা হবে। এই লড়াই তার প্রতি মুহূর্তের কামনা—নিত্য-শৃংখলিত জীবনে একমাত্র ক্ষণিক মুক্তির আস্বাদ সে পায় লড়াইএর মধ্যে দিয়ে। তার বন্দীত্বের মধ্যে আলস্যের অবসর নেই, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জর্জরিত করে রাখে বিউটি স্মিথ। রাগে ঘৃণায় প্রতিহিংসায় সর্বদা আগুন হয়ে থাকে তার দেহ মন, অন্তরের দুরন্ত দাহ তার মেটে কেবল লড়াইএর খোরাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরের ওপরই সারা দুনিয়ার প্রতিহিংসা মেটাবার সুযোগ তার মেলে। বিউটি স্মিথ জানে কী ভয়ংকর বলশালী হোয়াইট ফ্যাঙ। লড়াইতে কখনো সে হারে না। একদিন একের পর এক তিনটে কুকুরের সঙ্গে তাকে লড়তে হোলো। আর একদিন জঙ্গল থেকে সন্ত ধরে আনা এক পূর্ণবয়স্ক নেকড়েকে পুরে দেয়া হোলো খোঁয়াড়ের মধ্যে। তৃতীয় দিন দুটো কুকুর একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করল। এদিন নিজে আধমরা হয়েও শেষ পর্যন্ত সে দুটো কুকুরকেই মেরে ফেলল।

সে-বছর শরতের শেষে বিউটি স্মিথ হোয়াইট ফ্যাঙকে নিয়ে স্টিমারে করে ইউকন থেকে ডসনে যাত্রা করল। তখন সবে ফিস ফিস করে তুষার পড়তে সুরু করেছে, গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ দানা বেঁধে ভেসে

চলতে আরম্ভ করেছে নদীর স্রোতে। লড়িয়ে নেকড়ে বলে সারা অঞ্চলে হোয়াইট ফ্যাঙের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজের ডেকের ওপর একটা খাঁচায় তাকে পুরে রাখা হোলো, তাকে ঘিরে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। হয়তো সে রেগে দাঁত বার করে গর্জন করে তাদের তেড়ে যায়, না হয় চুপ করে শুয়ে হিংসাকুটিল চোখে তাদের হাবভাব দেখে। আর কিছু সে জানে না, জানে সুধু হিংসা করতে। দর্শকরা তাকে দেখে আমোদ পায়, কেউ লাঠি দিয়ে তাকে খোঁচা মারে, লাফিয়ে উঠে সে গর্ গর্ করে, –মজা পেয়ে সবাই হো হো করে হাসে। দুর্বিসহ তার জীবন, দুর্দমনীয় তার নিষ্ফল রাগ। উত্যক্ত হয়ে হয়ে ব্যর্থ বন্দীত্বের অপমান সয়ে সয়ে আরো রুক্ষ বিকট হয়ে ওঠে তার মেজাজ। কিন্তু হার সে মানে না, পোষ সে মানে না। সে স্বাধীন, তাই দিনে দিনে শয়তান না হয়ে উঠে তার গতি নেই।

হার মানবে সে কার কাছে? পোষ মানবে কার? বিউটি স্মিথ আর হোয়াইট ফ্যাঙ, ঠিক শয়তানের জুড়ি শয়তান। একে অপরের চরম শত্রু। লাঠি-হাতে মানুষ-প্রভুর সামনে ভয় পেয়ে মাথা নিচু করার মতো সদ্বুদ্ধি হোয়াইট ফ্যাঙের আগে ছিল, এখন আর নেই। এখন একবার বিউটি স্মিথকে দেখলেই রাগে তার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। দুজনে মুখোমুখি হলে তো কথাই নেই। সে তেড়ে যায় কামড়াতে, বিউটি স্মিথ মোটা লাঠি দিয়ে তাকে নির্মমভাবে মারে, মার খেতে খেতে সমানে সে গর্জন করে। যতো মারই মারুক বিউটি, তার ক্রুদ্ধ গর্জনটা কেড়ে নিতে পারে না কিছুতেই। শেষ ঘা-টা কষিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন বিউটি খাঁচা থেকে বার হয়ে আসে তখনো ফ্যাঙ বন্ধ দরজার গরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গজরায়। গজরায় সে শেষ পর্যন্ত, কাতরায় না একবারও!

ষ্টিমার এসে ডসনে লাগল, তীরে নামল হোয়াইট ফ্যাঙ। জনতার দৃষ্টি থেকে এখানেও তার নিস্তার নেই। এখানেও তার জীবন কাটতে

লাগল খাঁচার মধ্যে, দর্শকদের চোখের সামনে। তার নামডাক দারুণ ছড়িয়েছে—লোকে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল।

বিউটি তাকে শুধু দেখিয়েই পয়সা করতে লাগল। ফলে এক মিনিটের জন্যেও স্বস্তি সে পেত না। যদি বা সে ঘুমিয়ে পড়ত, লাঠির খোঁচায় তাকে জাগিয়ে রাখা হোতো,—পয়সা দিয়ে যারা দেখতে এসেছে তাকে, দামটা তাদের উশুল হওয়া চাই তো! খুঁচিয়ে ঠেঙিয়ে উত্যক্ত করে তাকে সব সময়ে রাগে আগুন করে রাখা হোতো—এ না হলে প্রদর্শনী জমে না। দর্শকের চোখে হোয়াইট ফ্যাঙ দুর্ধর্ষ ভয়াল, বুনো জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। তাই তাকে চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ংকর সেজেই থাকতে হয়। সুস্থ সে হতে পারে না কোনো সময়ে, তার চরিত্রের ভয়ংকর রূপটা বেড়েই চলে।

প্রদর্শনীতে তাকে দেখানো ছাড়া তাকে দিয়ে লড়ানোও হোতো। যখনই কোনো লড়াইএর ব্যবস্থা হোতো, তাকে খাঁচা থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হোতো শহরের বাইরে মাইল কয়েক দূরে জঙ্গলের মধ্যে। সেও রাত্রিবেলা, পাছে পুলিশে বাধা দেয়। এমন চেহারার এমন জাতের কুকুর নেই যার সঙ্গে তাকে লড়তে হয়নি। বন্য দেশ, দুর্দান্ত দর্শকের দল—এসব কুকুরের লড়াই সাধারণত শেষ হত মৃত্যুতে।

হোয়াইট ফ্যাঙ মরেনি, সে মেরেছে তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে। পরাজয় কাকে বলে সে তা জানে না। ম্যাকেঞ্জি হাউণ্ডদের সঙ্গে সে লড়েছে, ল্যাব্রাডর ও এস্কিমোদের কুকুরের সঙ্গে সে যুঝেছে, আমেরিকার উত্তর অঞ্চলের যতো ভীষণ ভীষণ জাতের বলিষ্ঠতম কুকুর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। মাটি থেকে বারেকের জন্যে তার পা টলাতে পর্যন্ত কেউ পারে নি কেউ। তার শক্তি, তার ক্ষিপ্রতা, তার লড়াইএর অভিজ্ঞতার কাছে হার মেনেছে আর সব লড়িয়ে কুকুর।

দিন যেতে লাগল। লড়াইএর সংখ্যাও কমে আসতে লাগল। তার সঙ্গে লড়তে পারে এমন কুকুর পাওয়া অসম্ভব। উপায় না দেখে বিউটি স্মিথ খাস নেকড়ে লেলিয়ে দিতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙের বিরুদ্ধে। ইণ্ডিয়ানরা ফাঁদ পেতে এসব নেকড়ে ধরত। সম্ভ ধরা দুর্দান্ত একটা নেকড়ের সঙ্গে ফ্যাঙের লড়াই দেখতে লোকের অভাব হোতো না, বিউটি স্মিথ দর্শনী আর বাজি কুড়িয়ে টাকাও করত যথেষ্ট। এসব লড়াইতেও সমানে হোয়াইট ফ্যাঙই জিতেছে। একবার জঙ্গল থেকে মস্ত বড়ো পূর্ণবয়স্ক একটা মাদী বনবিড়ালকে ধরে আনা হোলো। এটার সঙ্গে লড়তে হোলো হোয়াইট ফ্যাঙকে। ক্ষিপ্রতায় কেউ কারুর চেয়ে কম নয়, হিংস্রতায় মাদী বনবিড়ালের সমকক্ষ কে? এছাড়া ফ্যাঙ লড়ে শুধু দাঁত দিয়ে, বনবিড়ালের অস্ত্র যেমন দাঁত তেমনি তার চার পায়ের নখ। প্রাণ বাঁচাবার চরম লড়াই সেবার লড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ।

বনবিড়ালকে হারাবার পর সব লড়াই বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যাঙএর সঙ্গে লড়বার উপযুক্ত জন্তু আর মেলে না। দিনের পর দিন শুধু সে বাঁধা থাকে খাঁচার মধ্যে, লোকে পয়সা দিয়ে তাকে কেবল দেখে যায়। বসন্তকালে টিম কিনান্ বলে একজন পাকা জুয়াড়ী ডসনে এল। সঙ্গে তার একটা বুল-ডগ। এ দেশে এর আগে বুল-ডগ কেউ কখনো দেখেনি। অপরিহার্য যে এবার এই বুল-ডগটার সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙকে লড়তে হবে। লড়াইএর এক সপ্তাহ আগে থেকেই ঔৎসুক্যে ফেটে পড়তে লাগল লোক, কে জিতবে তাই নিয়ে সুরু হোলো গরম জল্পনা কল্পনা।

মরণ কামড়

গলা থেকে মোটা লোহার শিকলটা খুলে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল বিউটি স্মিথ। হোয়াইট ফ্যাঙের লড়াইএর ইতিহাসে এই প্রথম সে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করল না। থমকে দাঁড়িয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ, সাবধানী অথচ বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগল সামনের অদ্ভুত জ্যানোয়ারটাকে। এমনধারা চেহারার কুকুর এই প্রথম সে দেখছে। টিম কিনান্ মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে বুল-ডগটাকে সামনে ঠেলে দিল। বেঁটে মোটা বিরাট মাথা-ওয়ালা বুল-ডগটা থপ থপ করে বৃত্তের মাঝামাঝি কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। সেও কুঁতুল কুঁতুল চোখে পিট পিট করে দেখতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙকে।

উৎসুক জনতা তাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—ধর্ চিরোকি, ঝাঁপিয়ে পড়্! কামড়ে খেয়ে ফ্যাল্ ওটাকে!

চিরোকির কিন্তু লড়াই সুরু করার কোন উৎসাহই যেন নেই। সে ঘাড় বেঁকিয়ে লোকজনের দিকে তাকিয়ে ভালোমানুষের মতো তার টুকরো ল্যাজটা নাড়তে লাগল। সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, তবে কুড়েমি করছে, গরম হয়ে ওঠেনি। একটু অবাকও সে হয়েছে। ঝাঁকড়া লোম-ওয়ালা এ আবার কেমনধারা কুকুর? এর সঙ্গে লড়তে হবে নাকি? আসল কুকুর কই?

এগিয়ে এল টিম কিনান্। বুল্-ডগটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দু হাত দিয়ে তার কাঁধের দুধারে আদর করতে লাগল আর একটু একটু করে ঠেলতে লাগল সামনে। একটু পরেই বুল-ডগটার মুখ থেকে গর্ গর্ আওয়াজ বার হতে লাগল। টিম কিনান্ হাত বোলাতে লাগল জোরে জোরে, বুল-ডগের আওয়াজও বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

চুপ করে দেখতে লাগল ফ্যাঙ। বুল-ডগের গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের লোমও ফুলতে আরম্ভ করেছে। টিম কিনান্ তার বুল-ডগটাকে শেষ বারের মতো একটা ধাক্কা মেরে পিছিয়ে গেল। ধাক্কায় কয়েকটা পা এগিয়ে যাবার পর বুল-ডগটা ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে চলল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আক্রমণ করল হোয়াইট ফ্যাঙ। ঠিক যেন বুনো একটা বিড়াল,—সেই ভঙ্গিতে বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে সে বুল-ডগটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে পরক্ষণেই এক লাফে নাগালের বাইরে দূরে সরে গেল। চিৎকার করে উঠল চমকিত দর্শকের দল। বুল-ডগটার একটা কান থেকে ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ গভীর একটা ক্ষত, রক্ত ঝরছে ঝর ঝর করে।

একটু বিচলিত হোলো না বুল-ডগটা, মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ পর্যন্ত করল না। একবার মাথাটা নেড়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে অনুসরণ করে দৌড়ল। সারা ভিড় তখন দু-দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কী জিতবে,—হোয়াইট ফ্যাঙের ক্ষিপ্রতা, না চিরোকির ধৈর্য? নতুন নতুন বাজি ধরছে,—পুরোনো বাজির টাকা বাড়ছে। হোয়াইট ফ্যাঙ বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার শত্রুর ওপর, আর এক এক লহমায় এক একটা মোক্ষম কামড় লাগিয়ে সরে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। বুল-ডগটার কিন্তু রকমই আলাদা। সে সমানে ছুটে চলেছে হোয়াইট ফ্যাঙের পিছনে পিছনে,···বৃত্তের ধারে ধারে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরছে। মার সে কতো খাচ্ছে তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মনে আছে অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাই তার তাড়া নেই, ছটফটানি নেই। সে ছুটছে তার অবিচল উদ্দেশ্য নিয়ে, সে উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা দেখা যাবে সবুরে।

আশ্চর্য লাগছে ফ্যাঙের। এ কেমন ব্যবহার? কুকুরটার গায়ে লোমের ভারি আচ্ছাদন নেই, দাঁত সোজা হাড় মাংসের মধ্যে গিয়ে

ঝলে। বারে বারে সে দাঁত বসাচ্ছে—কুকুরটার আত্মরক্ষার যেন খেয়ালই নেই। এত যে মার খাচ্ছে, ভ্রূক্ষেপই নেই, চিৎকার পর্যন্ত করছে না। কিন্তু সমানে লেগে আছে পিছনে নিস্তব্ধ দুর্ভাগ্যের মতো।

কিন্তু পিছন পিছন দৌড়ালে কী হবে! ফ্যাঙকে ধরা চিরোকির সাধ্য নয়। এই সে আছে, আবার এই সে নেই। চিরোকিরও ফ্যাঙকে দেখে আশ্চর্য লাগছে কম নয়। আগে সে কখনো এমন কুকুরের সঙ্গে লড়েনি যাকে সে ঝাপটে ধরতে পারে নি। আসল কুকুরের লড়াইএ দু-পক্ষই ঝাপটা-ঝাপটি করতে চায়, এই তো তার অভিজ্ঞতা। এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত কুকুর, লাফায়, ঝাঁপায় আবার ঝট করে পালিয়ে যায় দূরে। দাঁত যখন বসায়, কামড়ে ধরে থাকে না, কামড় দিয়েই সরে পড়ে।

চিরোকিকে যতোই কামড়াক ফ্যাঙ, আসল জায়গায় কামড় বসাতে সে কিন্তু পারছে না, দাঁত তার পৌঁছচ্ছে না গলার নিচে শ্বাসনলীটার ওপর। বুল-ডগটা এত বেঁটে আর তাছাড়া তার বিরাট মাথা আর ভারি চোয়াল যেন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর! এখনো পর্যন্ত হোয়াইট ফ্যাঙের গায়ে আঁচড়টি লাগে নি, উল্টে কামড়ে কামড়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় মাথা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। হোয়াইট ফ্যাঙকে অনুসরণ করে একবার হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে লোকজনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। আর সেই মুহূর্তের সুযোগে হোয়াইট ফ্যাঙ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক কামড়ে তার সম্পূর্ণ একটা কান খাব্‌লা দিয়ে ছিঁড়ে নিল। শব্দ ফুটল চিরোকির গলায়—একটি মাত্র গম্ভীর গর্জন। উত্তেজনার একটুমাত্র আভাস ফুটল শরীরে। হোয়াইট ফ্যাঙের পিছনে বৃত্তাকারে আগের মতোই সে দৌড়তে লাগল—তবে এবার তার লক্ষ্য হোয়াইট ফ্যাঙের গলাটা। একবার

একচুলের জন্যে হোয়াইট ফ্যাঙের গলাটা চিরোকির কামড় থেকে বেঁচে গেল,—যেমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ আক্রমণ এড়িয়ে লাফিয়ে উল্টোদিকে সরে গেল, তা দেখে তারিফে হৈ হৈ করে উঠল দর্শকদল।

সময় বয়ে চলেছে, কিন্তু লড়াইএর রীতির কোন পরিবর্তন নেই; ফ্যাঙ সমানে লাফাচ্ছে, এগিয়ে এসে কামড়াচ্ছে, পিছিয়ে গিয়ে হার মানাচ্ছে নাগালকে আর করছে আঘাতের ধারাবর্ষণ। নিশ্চল দৃঢ়তা নিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলেছে চিরোকি। সে জানে, বয়ে যাক না সময় কিছুটা, শেষ পর্যন্ত সে জিতবেই, যত কামড়ই সে সহ্য করুক, সব-শেষের মরণ-কামড়ে তারই যেন অধিকার। কান দুটো তার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, গলায় ঘাড়ে পিঠে অগুন্তি ক্ষত, ঠোঁট দুটো পর্যন্ত দু-ফাঁক হয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। কী এসে যায় এ সব যন্ত্রণায়?

হোয়াইট ফ্যাঙ বারে বারে চেষ্টা করছে ধাক্কা দিয়ে চিরোকিকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে, কিন্তু কিছুতেই পারছেনা। সে যেমন লম্বা, চিরোকি তেমনি বেঁটে। পা গুলো তার মোটা মোটা, পেটটা যেন মাটিতেই লেগে আছে। একবার চিরোকি দৌড়টা একটু কমালো। এক লাফে উল্টোদিকে ফিরে ফ্যাঙ দেখল, চিরোকির মাথাটা বিপরীত দিকে ফেরানো, কাঁধটা একেবারে নাগালের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড-বেগে চিরোকিকে ধাক্কা মারল হোয়াইট ফ্যাঙ। কিন্তু তার নিজের উচ্চতা এতটা বেশি যে কাঁধে কাঁধে ধাক্কা লাগল না। ধাক্কার প্রচণ্ড বেগে নিজেই সে একেবারে চিরোকির দেহের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল ওদিকে। জীবনে এই প্রথম সে টাল সামলাতে পারল না, তার পা সরে গেল মাটি থেকে। নিজেরই বেগে একেবারে চিৎ হয়ে সে প্রায় পড়েছিল আর কি! তবু মাটিতে পড়বার আগেই অসীম ক্ষিপ্রতায় নিজেকে সামলে নিল, পড়ল এক কাত হয়ে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল

বটে, কিন্তু এরই মধ্যে চিরোকির শক্ত জোয়ালের ফাঁকে তার গলাটা আটকে গেছে।

কামড়টা ঠিক মোক্ষম জায়গায় পড়েনি, গলা থেকে অনেকটা নিচে বুকের কাছাকাছি। কামড় কিন্তু ছাড়বার নয়। লাফাতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ, ছুটতে লাগল পাগলের মতো, অতো বড়ো জানোয়ারটা কিন্তু আঠার মতো আটকে আছে তার গলায়। বিশাল ভারটা ছাড়াতে পারছে না কিছুতেই, টেনে রেখেছে তাকে ; মুক্তি নেই সেই টান থেকে। বিষম ফাঁদে সে পড়েছে, এ ফাঁদ থেকে ছাড়া তাকে পেতেই হবে। ক্ষেপে উঠল ফ্যাঙ, মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে জ্বলে গেল সমস্ত দ্বিধা। বাঁচতে তাকে হবেই, কাটতে হবেই এই সর্বনাশা বন্ধন। নড়তে হবে,—তাকে স্থানু করে রাখতে চায়, স্থানুত্ব জীবনের বিপরীত। কামড়ের বাঁধন লেগেছে গলায়, এই বাঁধন জীবনের পরিপন্থী।

দুর্দম আবেগে সে ছুটে বেড়াতে লাগল প্রাণপণ, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাগল, ঝাঁকাতে লাগল ঘাড়। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল গলা থেকে বুল-ডগের কামড়টাকে ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু গলায় আটকানো সেই জগদ্দল বোঝা নামানো অসম্ভব। বুল-ডগটা শুধু কামড়টা রেখেছে মোক্ষম করে, আর কিছু সে করছে না। মাঝে মাঝে সে মাটিতে চার পা লাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সে কামড়ের সঙ্গে ঝুলছে, মাটিতে গড়াচ্ছে, আছড়ে পড়ছে হোয়াইট ফ্যাঙের লাফের সঙ্গে সঙ্গে। চিরোকি বুঝেছে এইবার তার পালা, সে বুঝেছে কামড়টা যদি না ছাড়ে তো তাকে মারে কে? মাটিতে যতোই সে লুটোক, যতোই থেঁতলাক না শরীর, তার সমস্ত শক্তি সে তার দুই জোয়ালে পুঞ্জীভূত করে চোখ বুজে রয়েছে পরম খুসিতে

ক্লান্ত হয়ে প্রড়লো হোয়াইট ফ্যাঙ—থামল সে। কী বিপদ! এরকম লড়াই আগে সে কখনো করেনি! এমন নাছোড়বান্দা কামড়ের অভিজ্ঞতা কখনো তার হয়নি। এক পাশ ফিরে শুয়ে সে জিভ বার করে হাঁফাতে লাগল। চিরোকি তার পাশে শুয়ে তাকে একেবারে কাত করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ বাধা দিতে লাগল। সে অনুভব করল কামড়টা আর স্থির নেই, বুল-ডগের জোয়াল দুটো আস্তে আস্তে চিবুচ্ছে,—চিবিয়ে চিবিয়ে ওপরের দিকে এগোচ্ছে—তার কণ্ঠনলীর কাছাকাছি আসছে। এমনি সাংঘাতিক হোলো বুল-ডগের কামড়,—প্রতিদ্বন্দ্বী যখন ছটফট করে, তখন কামড়টা নড়ে না, চেপে বসে থাকে। তারপর যখন সুযোগ পায়;—তখন চিবিয়ে চিবিয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগোয়। দুই জোয়াল একবার যখন এক হয়, তখন তাদের ফাঁক করে কার সাধ্য!

হোয়াইট ফ্যাঙের দাঁতের নাগালে ছিল একমাত্র চিরোকির ফুলো ঘাড়ের ওপর দিকের অংশটুকু। কামড়ে কামড়ে সে চিরোকির ঘাড়টা ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। কিছুটা পরে নাগাল সরে গেল, বুলডগটা তাকে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসল; তার কামড়ের কিন্তু নড়চড় নেই। বেড়ালের মতো পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে পিছনের দুই পা দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ বুল-ডগটার বুক পেট আঁচড়াতে লাগল। চিরোকির পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত এমনি আঁচড়ে বেরিয়ে আসত যদি না সে একলাফে ফ্যাঙের বুক থেকে নেমে পড়ত। কামড় কিন্তু ঠিকই রইল।

এই কামড় থেকে মুক্তি নেই,—এ ভাগ্যের মতো ভয়ংকর, ভাগ্যের মতো অবশ্যম্ভাবী। আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কামড়টা ঠেলে উঠতে লাগল ফ্যাঙের গলার দিকে। গলার নরম চামড়া আর ঘন লোম হোয়াইট ফ্যাঙকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। তার

গলার চামড়া ভাঁজে ভাঁজে চিরোকির দাঁতের মধ্যে আটকে রইল, আর লোমগুলো প্রতিহত করল জোয়ালের চাপকে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে হোয়াইট ফ্যাঙের গলার চামড়া চিবিয়ে চিবিয়ে মুখের মধ্যে পুরতে লাগল চিরোকি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আস্তে আস্তে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ফ্যাঙের। প্রাণান্তকর হয়ে উঠল প্রতিটি নিঃশ্বাস।

ব্যস! লড়াই খতম হতে আর বাকি কী? চিরোকির যারা সমর্থক তারা নাচতে লাগল উদ্দাম উৎসাহে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বড়ো বড়ো বাজি ধরতে লাগল। যারা ভেবেছিল হোয়াইট ফ্যাঙ জিতবে তারা ম্রিয়মান, তাদের গলায় আওয়াজ নেই। কেবল বিউটি স্মিথ ছাড়া। সে রোখ করে বাজি ধরল,—তার কুকুর হারলে পঞ্চাশ, জিতলে এক। তারপর লড়াইএর বৃত্তের মধ্যে এক পা এগিয়ে ফ্যাঙের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সে খল্ খল্ করে হাসতে লাগল,—সেই বিদ্রূপের জ্বালা-ধরানো হাসি, যা হোয়াইট ফ্যাঙ সইতে পারে না। যেন চাবুকের মার এই হাসি! তার সমস্ত শক্তি এক করে আবার সে উঠে দাঁড়াল, দৌড়তে লাগল বৃত্তের চারদিকে। তার গলায় ঝুলছে পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের ভারী বুল-ডগটা। ছুটছে সে অন্ধের মতো উন্মাদের মতো, নিরুপায় প্রাণের দায়ে,—ক্রোধের আবেগে নয়, মৃত্যুর আতংকে। ছুটতে ছুটতে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এক এক ঝটকায় সে শত্রুকে এধারে ওধারে আছড়িয়ে ফেলছে। কিন্তু কিছুতে খসাতে পারছে না সর্বনাশা মরণ-কামড়।

এতক্ষণে বুঝি সত্যিই লড়াই শেষ হোলো। শক্তির শেষ বিন্দুটুকু উজাড় হয়ে গেল ফ্যাঙের। লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে, পড়ে রইল নিশ্চল পাথরের মতো। সেই মুহূর্তে বুল-ডগ তার কামড়টাকে পাকা করে নিল ফ্যাঙের গলার আরো অনেকটা চামড়া মুখে পুরে নিয়ে।

জনতা 'চিরোকি, চিরোকি' বলে উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল। চিরোকির জোয়াল আরো চেপে বসতে লাগল ফ্যাঙের গলায়, জয়ের উচ্ছ্বাসে ঘন ঘন নড়তে লাগল তার কাটা ল্যাজের গোড়াটা।

এমনি সময়ে নতুন একটা ঘটনা ঘটে গেল। দূর থেকে ভেসে এল ঘণ্টার শব্দ, এক বিউটি স্মিথ ছাড়া আর সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল— পুলিশ নয়তো? না, পুলিশ নয়। একপাল কুকুর-জোতা একটা স্লেজ। স্লেজে দুজন লোক। ভিড় দেখে স্লেজ থামিয়ে যাত্রী দু-জন নামল। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখতে লাগল ব্যাপারটা কী। একজন পরিষ্কার গোঁফ-দাড়ি কামানো চমৎকার পোষাক পরা সুশ্রী-দর্শন যুবাপুরুষ, তার সঙ্গীটি মধ্যবয়সী—সারা মুখ জুড়ে ইয়া একজোড়া গোঁফ।

হোয়াইট ফ্যাঙ তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে থর থর করে। তার শ্বাসনলীর ওপর বুল-ডগের কামড়ের চাপ বাড়ছে, নিঃশ্বাস নিতে আর যেন সে পেরে উঠছে না। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার ফাঁকে তার শ্বাসনলীটার নাগাল চিরোকি পেল বলে।

বিউটি স্মিথের অন্তর্নিহিত পৈশাচিকতা সহসা প্রকাশ পেল পুরোমাত্রায়। বীভৎস উন্মত্ততায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙের ওপর। ফ্যাঙের চোখের তারা তখন প্রায় স্থির হয়ে এসেছে। এবার ব্যাটা মরবে, লড়াইএ হবে হার। বাজিমাৎ হতে দেরি নেই। পাশবিক নিষ্ঠুরতায় সে আধমরা কুকুরটাকে সজোরে লাথির পর লাথি মারতে লাগল। জনতার মধ্যে কেউ কেউ সমবেদনাসূচক শব্দ করে উঠল মুখ দিয়ে, কিন্তু এর বেশি নয়। বুনো একটা কুকুর লড়াইএ মরছে, মরার মুহূর্তে মালিকের কাছে শেষ শাস্তিটা পাচ্ছে, কার কী এসে যায়!

জনতার মধ্যে নতুন একটা গুঞ্জন উঠল। ধাক্কা দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সামনে এগিয়ে চলল তরুণ আগন্তুকটি। কোনো দিকে তার

ভ্রূক্ষেপ নেই। বিউটি স্মিথ বোধহয় শেষ লাথিটা মারবার জন্যে ডান পা তুলেছে, এমন সময় তার মুখের ওপর পড়ল প্রচণ্ড একটা ঘুসি। ছিটকে কয়েক গজ দূরে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে বরফের ওপর। যুবাপুরুষটি জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ইস্পাত-কঠিন চোখে তাকিয়ে থম্‌থমে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট গলায় বলে উঠল,—কাপুরুষ, যতো সব কাপুরুষের দল!

সবার বাড়া কাপুরুষ বিউটি ততক্ষণ বরফ থেকে উঠে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। একটি ঘুসি খেয়েই তার তখন শোচনীয় অবস্থা। যুবাপুরুষটি ভাবল হয়তো লোকটা লড়বে, তাই তাকে দাঁড়াবার অবসর না দিয়েই আবার সে ঘুসি চালাল। দ্বিতীয়বার মাটিতে ছিটকে পড়ে বিউটি স্মিথ আর উঠল না। মনে মনে ভাবল,—রকম ভালো নয়, মাটিই এখন ভালো।

যুবকটির সঙ্গীও ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছিল, তাকে সে কাছে ডাকল,—এগিয়ে এস ম্যাট, হাত লাগাও তো!

কুকুরদুটোর ওপর ঝুঁকে পড়ল দুজনে। ম্যাট ধরল হোয়াইট ফ্যাঙকে, যুবকটি চিরোকির মুখটা ধরে তার চোয়ালদুটো ফাঁক করবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রাণপণে টানাটানি করতে করতে গজ গজ করতে লাগল,—জানোয়ার, জানোয়ার সব!

অশান্ত হয়ে উঠল লোকজন—কে হে মাতব্বর, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে ফুর্তিটাই মাটি করছে! দেব নাকি ঠাণ্ডা করে? কিন্তু যুবকটি একবার তাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠতেই সবাই আবার ভয়ে ভয়ে চুপ করল।

ম্যাট বললে,—মিঃ স্কট, আর বাকী নেই।

যুবক উত্তর দিল,—না হে, দেখছ না গলার নলীটা এখনো ধরতে পারেনি! এখনো আশা আছে।

স্কট অধীর হয়ে বুল-ডগটার মাথায় ঘুসি মারতে লাগল। তাতেও কোনো লাভ নেই। বুল-ডগের কামড় মরণ-কামড়, তাকে ছাড়ানো অসম্ভব। অন্য লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। সাহায্য করতে এগিয়ে এল না একজনও।

শেষ পর্যন্ত স্কট কোমর থেকে বার করল রিভলভার। বুল-ডগের চোয়ালের ফাঁকে রিভলভারের নলটা ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। আপ্রাণ শক্তিতে ঠেলতে ঠেলতে শেষ পর্যন্ত সে নলটা দুই চোয়ালের মাঝখানে এক কোনে ঢোকাতে পারল। মড়মড় করে উঠল চিরোকির দাঁত। টিম কিনান্ এবার এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত দিল, হাঁক দিয়ে উঠল,—খবরদার, দাঁত যেন না ভাঙে!

দাঁতে দাঁত চেপে স্কট বললে,—দাঁত যদি না ভাঙে তো আমি এটার ঘাড় ভাঙব।

আবার হাঁক দিয়ে উঠল কিনান্,—খবরদার, ভালো হবে না বলছি!

কিন্তু ভয় পাওয়ার মানুষ স্কট নয়। হাত থামিয়ে মুখ তুলে কিনানের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বললে,— তোমার কুকুর?

কিনান্ বললে—হুম্।

তাহলে হাত লাগাও, খোলো এটার দাঁত।

ঠাট্টার হাসি হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে কিনান্ বললে,—মাফ করো ব্রাদার, ও কর্ম তোমার আমার কারুর নয়!

বটে? তাহলে সরে দাঁড়াও, কাজ করতে দাও আমাকে।

টিম্ কিনান্ খাড়া দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু স্কট আর লক্ষ্যই করল না তাকে। বুল-ডগের চোয়ালের একদিকে বন্দুকের নলটা সে ঢুকিয়েছিল, এবার সে সেটাকে ঠেলে ঠেলে অন্য দিকের চোয়ালটা ফাঁক করবার চেষ্টা করতে লাগল। দুই চোয়ালের ফাঁকে আড়াআড়ি ভাবে নলটা ঢুকিয়ে দিয়ে সে আস্তে, আস্তে হাতের

জোরে কামড়টা আলগা করতে সুরু করল। একটু একটু করে ফাঁক হয় চোয়াল আর ম্যাট একটু একটু করে ফ্যাঙের গলাটা ছাড়িয়ে আনে। এমনি প্রচণ্ড পরিশ্রম চলল কতোক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত স্কট বললে কিনান্‌কে, --পাকড়াও তোমার কুকুর !

টিম্‌ কিনান্‌ নিতান্ত সুবোধের মতো এগিয়ে এসে চিরোকিকে চেপে ধরল।

এইবার,— বলে রিভলভারের নলে শেষ মোক্ষম চাপ দিয়ে স্কট বুল-ডগের দাঁত দুটোকে ফাঁক করে তার মুখটা হাঁ করিয়ে ফেলল। টিম কিনান্‌ জোর করে টেনে সরাল তার কুকুরকে। সেটা তখনো ছটফট করছে আর গজরাচ্ছে।

ধমক দিয়ে উঠল স্কট,— সরিয়ে নিয়ে যাও ওটাকে !

বুল-ডগটাকে টানতে টানতে গুটি গুটি পিছু হটল কীনান্‌।

হোয়াইট ফ্যাঙ বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে। একবার সে খাড়া হোলোও, কিন্তু অথর্ব পাগুলো ভার সইতে পারল না। বরফের ওপর আবার সে লুটিয়ে পড়ল। চোখদুটো তার আধ-বোজা,—দৃষ্টি-হীন। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা, তার মধ্যে থেকে শুকনো চামড়ার মতো রক্তহীন জিভটা বার হয়ে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ তার সারা চেহারায়।

ম্যাট তাকে পরীক্ষা করে দেখল,—না, নিঃশ্বাস এখনো পড়ছে কর্তা ! সামলে নেবে মনে হচ্ছে !

স্কট এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—ম্যাট, এমনি একটা জোয়ান স্লেজ-টানা কুকুরের দাম কতো ?

তার নিজের স্লেজের কুকুরগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে স্কট ম্যাটকে নিযুক্ত করেছে। কুকুর চেনা ম্যাটের পেশা। হোয়াইট

ক্যাণ্ডের শুশ্রূষা করতে করতে একটু হিসেব করে নিয়ে সে উত্তরে বললে,—তিনশো ডলার।

আর এটার মতো চিবিয়ে-খাওয়া আধমরা কুকুরের দাম?

তা ধরুন অর্ধেক,—দেড়শো।

পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দেড়শো ডলারের নোট গুণে হাতে নিয়ে স্কট বিউটি স্মিথের দিকে ফিরে তাকালো। হেঁকে বললে,—ও জানোয়ার মশাই, তোমার কুকুর আমি কিনে নিলাম। ধরো টাকা।

বিউটি স্মিথ উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত পিছনে রেখে বললে,—বিক্রী করছে কে!

কে আবার, তুমি। আর কিনছি আমি। টাকা দিচ্ছি দেখেও বুঝতে পারছ না?

বিউটি স্মিথ নোট ছুঁলো না। দুপা পিছিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তেড়ে গেল স্কট, এই বুঝি লাগায় এক ঘা।

বিউটি স্মিথ নাকি সুরে বললে,—বিক্রী করব কি করব না, সে আমার অধিকার।

অধিকার? এবার রাগে ফেটে পড়ল স্কট—কোনো অধিকার আর তোর নেই কুকুরটার ওপর। লজ্জা করে না এখনো? টাকা নিবি কিনা বল্! নইলে খাবি আর একটা ঘুসি!

ভয়ে আঁৎকে উঠল বিউটি স্মিথ। আর্তস্বরে বললে,—নেব, নেব। কিন্তু আমিও দেখে নেব, সহজে ছাড়ব না। জোর করে আমাকে বিক্রী করাবে? ডসনে একবার যাই, নালিশ করব আমি।

ডসনে গিয়ে মুখ খুলেছিস কি দেশছাড়া করব আমি তোকে, বুঝেছিস?

গোঁ গোঁ করতে লাগল বিউটি স্মিথ।

হঠাৎ আবার বজ্রগর্জনে চেঁচিয়ে উঠল স্কট,—বুঝেছিস, বল্, বল্, বুঝেছিস?

পায়ে পায়ে পিছতে পিছতে বিউটি আস্তে আস্তে বললে,—হ্যাঁ।

হুঁ, শুধু হুঁ! হুঁ কি হতভাগা?

দাঁত বার করে বিউটি স্মিথ বললে,—আজ্ঞে, হুঁ স্যর!

কে একটা লোক ফস্ করে বলে উঠল,—কি রকম দাঁত বার করছে দেখ ব্যাটা! কামড়াবে না কি?

নিস্তব্ধ অবাক জনতা সহজ হোলো এতক্ষণে। হো হো করে হেসে উঠল সবাই। আধমরা হোয়াইট ফ্যাঙের পাশে বসে তার নতুন মালিক তার পরিচর্যায় হাত লাগাল।

অদূরে সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিম কিনান্ প্রশ্ন করল,—কে হে মাতব্বরটা?

একজন বললে,—জানো না? ও হচ্ছে উইডন স্কট।

সে-টা আবার কে?

ওরে বাবাঃ! ও হচ্ছে মস্ত মাইন্-ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী কর্তাব্যক্তিদের মহা পেয়ারের লোক! গোল্ড কমিশনারের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। বিপদে পড়তে না চাও তো ওকে ঘাঁটিয়ো না, এ আমি বলে দিলাম।

জুয়াড়ী কিনান্ বললে,—আমারও মনে হয়েছিল, লোকটা একটা কেউ-কেটা হবে। তাই কিছু বলিনি। নইলে মজাটা একবার টের পাওয়াতাম বাছাধনকে।

প্রেমিক প্রভু

দূর থেকে উইডন স্কটকে আসতে দেখেই হোয়াইট ফ্যাঙ লোম খাড়া করে দাঁত বার করে গর্ গর্ করতে লাগল। খবরদার,—শাস্তি সে সহজে মেনে নেবেনা। শাস্তি দিতে এলে লড়ে যাবে সে ঠিক। স্কটের হাতটা সে কামড়ে কাহিল করে দিয়েছে। সারা হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। মানুষ-প্রভুকে সে আক্রমণ করেছে। এবার আসছে ভীষণ শাস্তি। সেও দেখে নেবে।

ম্যাট আর স্কটের শুশ্রূষায় ফ্যাঙ সেরে উঠল অল্প দিনে। কিন্তু সে তো পোষা কুকুর নয়। শয়তানের ঘরে বাসা বেঁধেছিল এতদিন, শয়তান ছাড়া আর কিছু নয় সে। একটু বল পেতেই নিজ মূর্তি সে ধারণ করল। মানুষের প্রতি তার চরম ঘৃণা, জ্বালা-ধারালো প্রতি-হিংসা। ভয় তার মোটা লাঠিকে। লাঠি হাতে তার কাছে এগিয়ে এসে একদিন ম্যাট তার গলার শিকলটা খুলে দিল। মাসের পর মাস যতোদিন বিউটি স্মিথের কাছে সে ছিল, স্বাধীনতা কাকে বলে জানত না—থাকত খোঁয়াড়ে খাঁচায়,—গলায় মোটা লোহার চেন। ছাড়া পেত সুধু যখন লড়াই করতে হোতো তখন। মুক্তির স্বাদ সে ভুলেই গেছে।

ছাড়া পেয়েই সে অহেতুক আক্রমণ করল স্লেজটানা কুকুরের দলের দলপতিকে। পৈশাচিক উন্মত্ততায় সেটাকে সে মারল। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

স্কট বললে,—ভুল করেছি। রিভলভারটা বাগিয়ে এগোতেই ম্যাট তাকে আটকাল, কাকুতি মিনতি করে বললে,—কর্তা, একটি বার ওকে

ক্ষমা করুন। ও তো পোষমানা স্লেজ-টানা কুকুরই এককালে ছিল। দেখছেন না গলায় পিঠে বগলসের দাগ!

স্কট বললে,—বেশ, দ্বিতীয়বার আর কিন্তু নয়। ভালোয় ভালোয় পোষ মানে তো আপত্তি নেই।

হোয়াইট ফ্যাঙের দিকে পা বাড়াতেই হাঁ-হাঁ করে উঠল ম্যাট,—আরে, করছেন কী, লাঠিটা নিন হাতে!

আরে পাগল, লাঠি উঁচিয়ে গেলে কি আর পোষ মানানো হয়?

ঘৃণা আর সন্দেহে ভরা কুটিল চোখে তার দিকে তাকাল ফ্যাঙ। মারবে নাকি? মারলেই হোলো? স্কট এগিয়ে এসে মিষ্টি কথা বলে তার মাথার দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ জ্বলে উঠল ফ্যাঙের, নিমেষে তার দাঁতের ঘা পড়ল স্কটের উদ্যত হাতটাতে, ঠিক যেন সাপের ছোবল।

আর্তনাদ করে স্কট তার ঘা-খাওয়া হাতটা চেপে ধরল অন্য হাত দিয়ে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল। ম্যাট চিৎকার করে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। হোয়াইট ফ্যাঙ কুঁজো হয়ে মুখ নিচু করে গোঁ গোঁ করছে, হিংস্রা-কুটিল লোমগুলো তার ফুলে ফুলে উঠছে, চোখে বিষাক্ত দৃষ্টি। এবার সে মা' খাবে ঠিক, তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সে।

ম্যাট কেবিন থেকে বন্দুক নিয়ে এল। স্কট বললে,--আরে, করছ কী?

ম্যাট বললে,—কিছু না। আপনার কথাই ঠিক। আমার কথাও আমি রাখছি। ওটাকে গুলি করার পালা এবার আমার!

এর আগের বার স্কটের হাতে ছিল রিভলভার, ম্যাট তাকে আটকেছিল। এবার রিভলভার ম্যাটের হাতে; অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে স্কটই এবার ফ্যাঙকে বাঁচাল ম্যাটকে অনেক অনুরোধ করে।

এই ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা কেউ তাকে ঘাঁটায়নি, কেউ তার কাছে আসেনি। এতক্ষণ পরে আবার তার নতুন প্রভু আসছে হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে। তটস্থ হয়ে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ।

দেবতা তার সামনা-সামনি এসে কয়েক হাত দূরে বসল। এ কেমন হোলো! শাস্তি দিতে হলে দেবতারা সামনে এসে শক্ত পায়ে দাঁড়ায়, পা গুটিয়ে বসে না তো কখনো? তাছাড়া দেবতার হাতও তো খালি! লাঠি নেই, বন্দুক নেই, একটা চাবুক পর্যন্ত নেই! তার নিজের গলাতেও তো বাঁধন আঁটল না! ইচ্ছে করে দৌড়ে পালাতেও সে পারে। তবে ভয় কী? দেখাই যাক না কী হয়!

তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দেবতা, কিছুক্ষণ গর্‌গর্‌ করার পর আপনি থেমে গেল ফ্যাঙের আওয়াজ। এবার কথা বলতে সুরু করল দেবতা। বকছে না, ধমক দিচ্ছে না,—আস্তে আস্তে মন-ভোলানো মিষ্টি কথা বলছে, কথা দিয়ে যেন আদর করছে। ভুলিয়ে দিচ্ছে ফ্যাঙের মনের সংশয়, জুড়িয়ে দিচ্ছে বিতৃষ্ণার দাহ। কতক্ষণ সে এমনিভাবে সামনে বসে কথা বলে চলল। গোঁ গোঁ আওয়াজ বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল ফ্যাঙ,—একটু একটু করে সন্দেহ যায়, আবার নতুন করে সন্দেহের ঢেউ আসে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেবতা উঠে তার কেবিনের মধ্যে গেল। সন্দিগ্ধচোখে অপেক্ষা করতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। কেবিন থেকে বেরিয়ে আবার সে ফ্যাঙের কাছে যখন এল,—আশ্চর্য্য, এবারও হাতে কোনো অস্ত্র নেই! আহত হাতটা বুকের কাছে ঝোলানো, বাঁ হাতে এক টুকরো মাংস। মাংসটা সে হাত বাড়িয়ে কুকুরটার দিকে ধরল। হোয়াইট ফ্যাঙ কান খাড়া করে দূর থেকে মাংসটার দিকে নাক বাড়িয়ে শুঁকতে লাগল। একবার সে দেবতার দিকে তাকায়,

আর একবার মাংসখণ্ডটার দিকে। বিস্ময় আর সংশয়ের দোলায় মন তার দোলে। তৈরি হয়ে থাকে হঠাৎ কোনো বিপদের আভাস পেলেই লাফ মারবার জন্যে।

কিন্তু বিপদ কই? টাটকা মাংসের লালা-ঝরানো সুগন্ধ আবার বিপদ নাকি? তবু সাবধান। দেবতাদের অখণ্ড ক্ষমতা, ওরা সব পারে। কে জানে ঐ মাংসের টুকরোটার মধ্যে কোন্ সাংঘাতিক বিপদ লুকিয়ে বসে আছে! খবরদার, ও মাংস খেতে হবে না।

দেবতা মাংসের টুকরোটা ছুঁড়ে দিল মাটিতে ঠিক তার নাকের সামনে। এমনি করলে কে আর পারে বলো? কে পারে লোভ সামলাতে? নাক দিয়ে শুঁকল, জিভ দিয়ে চাটল, তারপর টুকরোটা মুখে পুরল ফ্যাঙ। কই, কী বিপদ হোলো? কিচ্ছু তো না! আরে বাঃ, চমৎকার খেতে তো! মুখ তুলে ফ্যাঙ দেখে, প্রভু আর এক-টুকরো মাংস তার সামনে ধরেছে। সরাসরি হাত থেকে টুকরোটা মুখে তুলে নিতে এবারও তার ভরসা হোলো না। মাংসটা মাটিতে ছুঁড়ে দিতে তবে সে মুখে পুরল। এমনি চলল কয়েকবার। তারপর শেষকালে একবার দেবতা মাংসের টুকরো আর কিছুতেই মাটিতে ফেলল না, ধরে রইল হাতেই।

মাংসটা মধুর। কয়েক টুকরো চিবিয়ে ক্ষিধেও বেড়ে উঠেছে,—লোভের তো কথাই নেই। পায়ে পায়ে সে এগোলো। দেবতার দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে লোম খাড়া করে অতি সন্তর্পণে ঘাড় বেঁকিয়ে সে মুখ বাড়াল হাতের দিকে। দু-একবার ভয়-দেখানো গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়ল। তারপর হাত থেকে কামড়ে কামড়ে মাংসটা খেল। কই? শাস্তি কই? মাংসটা চিবুচ্ছে খোস মেজাজে। যতো না আরাম লাগছে তার চেয়ে বেশী লাগছে বিস্ময়।

খানিকক্ষণ পরে কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে ম্যাট থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাজ্জব ব্যাপার! দেখে,—ঠ্যাঙ ছড়িয়ে চোখ বুজে শুয়ে পরমানন্দে ল্যাজ নাড়ছে কুকুরটা, আর উইডন স্কট তার সামনে উঁচু হয়ে বসে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ম্যাটকে দেখেই লাফিয়ে উঠল কুকুরটা, লাফিয়ে দূরে সরে গেল দাঁত বার করে। স্কট আবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে গিয়ে তাকে চেপে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলল, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে তাকে সুস্থির করতে একটুও তার দেরি হোলো না।

খুব দেখালেন কর্তা,—আনন্দের আতিশয্যে ম্যাট বলে উঠল,—জবরদস্ত ইঞ্জিনিয়ার আপনি হয়েছেন বটে, কিন্তু ছেলেবেলাতেই সার্কাসের দলে ভিড়ে গেলে নাম হোতো আরো বেশি!

হোয়াইট ফ্যাঙের জীবনের একটা অধ্যায়ের অবসান হোলো এতদিনে। বন্ধনের অভিশাপ, হিংসার আশ্রয় তার ঘুচল, ভাগ্য থেকে নামল শয়তানের ভর। এক নতুন অপূর্ব মধুর জীবনের দ্বারে সে এসে দাঁড়িয়েছে—ভাগ্য হেসেছে প্রসন্ন হাসি। এর মূলে উইডন স্কটের নিত্য-সহিষ্ণু পরিশ্রম, অক্লান্ত অধ্যাসায়। হোয়াইট ফ্যাঙের সারা অন্তর জুড়ে একটা মহা বিপ্লব ঘটে যেতে লাগল দিনে দিনে, পলে পলে সে ভুলতে লাগল তার দুঃস্বপ্ন-ভরা পুরোণো জীবনের অভিজ্ঞতা।

যে জীবনের সঙ্গে তার এতদিনের পরিচয় তা মূল্যহীন হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল তার এতদিনকার শয়তানের শিক্ষানবিশি। প্রথমবার অরণ্যকে অস্বীকার করে গ্রে বিভারের আশ্রয়কে যখন সে মেনে নেয়, মস্ত বড়ো একটা পরিবর্তন তখন তার হয়েছিল। কিন্তু তখন সে ছিল শিশু, ঘটনার সঙ্গে সন্ধি করা তখন ছিল নিতান্ত সহজ। কিন্তু এখনকার

পরিবর্তন সহজ নয়। এতদিনে অভিজ্ঞতা তাকে পাকে পাকে বেঁধেছে, দিনে দিনে নিষ্করুণ বীভৎস দানবে পরিণত করেছে তাকে। হিংসা আর রাগ, কুটিলতা আর দুর্মতা জগদ্দল পাথর হয়ে বসেছে তার সারা অন্তর জুড়ে। এবারের রূপান্তর বৈপ্লবিক।

তবু সে বদলাল। ভালোবাসার স্পর্শ দিয়ে দিয়ে নতুন ছাঁচে তাকে নতুন করে গড়ে তুলল উইডন স্কট। মনের গভীর কন্দরে রক্তের সুগোপন অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল একটি ক্ষুধা, যার পরিচয় নিজেই সে কখনো পায়নি। সে ক্ষুধা স্নেহের, ভালোবাসার। সে ক্ষুধার তৃপ্তি যদি হয় তবেই না মানুষ-দেবতার সঙ্গে আরণ্য-শ্বাপদের সম্পর্কের সব ব্যবধান ঘুচে যায়! অকৃপণ হাতে ভালোবাসার দান দিল উইডন স্কট,—অকৃত্রিম একনিষ্ঠ ভালোবাসা সে আদায় করল বোবা জন্তুটার কাছ থেকে।

কিন্তু একদিনেই নয়,—দিনের পর দিনের অধ্যবসায়ে। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র বিতৃষ্ণাটা কাটল, ফ্যাঙএর একটু একটু পছন্দ হতে সুরু হোলো নতুন প্রভুকে। এতদিন দেবতাদের আশ্রয়ে তার কেটেছে, দেবতা ছাড়া সে থাকতে পারে না। বিউটি স্মিথ ছিল শয়তান দেবতা। এ দেবতা তো তেমন নয়! তাছাড়া এ দেবতা দিয়েছে অমূল্য ধন—স্বাধীনতা। পালিয়ে যদি যায়, দেবতা বাধা দেবে না,—তাই তো সে বাঁধা পড়েছে।

উইডন স্কট যে হোয়াইট ফ্যাঙকে পোষ মানাচ্ছে তা নয়,—আসলে সে সমস্ত মানুষের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে এই বোবা কুকুরটার কাছে। মানুষ অনেক অন্যায় করেছে, এই অবোধ জন্তুটার কাছে মানুষের জমা হয়েছে অনেক দুষ্কৃতির ঋণ, সেই ঋণ শোধ দিতে হবে। কাজেই উইডন স্কট ফ্যাঙকে আদর করতে বাকি রাখছে না।

আস্তে আস্তে ভালো লাগছে এই আদর—অবাক লাগছে; নতুন দেবতার হাতের স্পর্শ এত মিষ্টি! গলার রাগ-বিদ্বেষ-ভরা গর্জন—যে

গর্জন হঠাৎ শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়,—সেই গর্জন সে ভুলছে, গলা থেকে বার হচ্ছে নতুন রকমের ঘড় ঘড় শব্দ—নির্ভরতার, বিশ্বাসের, পরিতৃপ্তির।

পরিতৃপ্তি বৈকি! কোথায় ছিল একটা অজানা অভাব, একটা অপরিচিত ক্ষুধা! ছিল লুকিয়ে বেদনায়, চঞ্চলতায়। তৃপ্তি হচ্ছে তার, পরম তৃপ্তি। এই নাকি ভালোবাসা? এরই জন্যে নাকি মন এতদিন কাঙাল হয়ে ছিল? তৃষ্ণা মেটে প্রভুর সাহচর্যে, তৃষ্ণা সুরু হয় প্রভুর অদর্শনে। এই ভালোবাসা নতুন জীবনে অবতীর্ণ করল বোকা ফ্যাঙকে। যতো ভালোবাসা সে পায়, দিতে চায় আরো বেশি। প্রভুত্ব যতো নিবিড় হয়, ততো সে আকুল হয়ে ওঠে বশ্যতায়, আত্মনিবেদনে। ভাবনা কী? এতদিন পরে সে পেয়েছে প্রেমিক প্রভু। প্রেমিক প্রভুর চোখে চোখ রেখে সূর্যমুখীর মতো বিকশিত হচ্ছে তার অন্তর।

এই আত্মনিবেদনকে মূর্তি দিতে পারে না হোয়াইট ফ্যাঙ, পারে না এই নবলব্ধ অনুভূতিকে উচ্ছলতা দিয়ে প্রকাশ করতে। কেমন করে পারবে! সে যে আর নতুনটি নেই, ছোটটি নেই। সে যে বড়ো একলা, একান্ত আত্মকেন্দ্রিক! ভুলবে কেমন করে এতদিনের অভ্যাস, কেমন করে বরবাদ করে দেবে জীবনের এতটা অভিজ্ঞতা? সারা জীবন সে গর্জন করেছে অনেক, কিন্তু খুসির ডাক কখনো ডাকেনি। প্রেমিক প্রভু যখন সামনে আসে তখন খুসির আবেগে সে শিউরে ওঠে, কিন্তু দৌড়ে কাছে যেতে পারে না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করে প্রভুর স্পর্শের আশায়। বিশ্বাস করতে পারে না, ভালবাসায় এত সুখ! ভাষাহীন আতিশয্যহীন আত্মবিসর্জিত প্রেম নীরবে সে সমর্পণ করছে প্রভুর পায়ে। নিস্পন্দ দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে তাকিয়ে বোবা চোখের নিবিষ্ট ভাষায় সে প্রকাশ করতে চায় নিজের আকুতি। কেন সে সহজ হতে পারছে না, কেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারছে না? কিসের এত আড়ষ্টতা? এত লজ্জা কেন?

ফ্যাঙের প্রথম কাজ হোলো প্রভুর কেবিনের দরজায় পাহারা দেওয়া। দুদিনে সে চিনল,—কে অতিথি আর কে অবাঞ্ছিত আগন্তুক।

প্রভুর কেবিন পাহারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো নতুন নতুন শিক্ষা ফ্যাঙ পেতে লাগল। প্রধান শিক্ষা প্রভুর অন্য কুকুরদের সঙ্গে লড়াই না করার। দু একটা লড়াইএর পরই নতুন কুকুরের দল তাকে নেতা বলে মেনে নিল; ফ্যাঙ আর তাদের ওপর কখনো চড়াও হোলো না। দ্বিতীয় শিক্ষা ম্যাটকে স্বীকার করার। ম্যাট-ই তাকে খেতে দেয়, তার দেখাশুনো করে। তবু সে ঠিক বোঝে ম্যাট ভৃত্য, প্রভু নয়। প্রভুকে ভালোবাসা, তার ভৃত্যকে স্বীকৃতি। এ ছাড়া স্লেজ টানে ফ্যাঙ। এরা স্লেজের কুকুরগুলোকে পাখার মতো করে সাজায় না,—একের পিছনে আর একটাকে দাঁড় করিয়ে দুই লাইনে সাজায়। সবার আগে দুই লাইনের মাঝখানে দাঁড়ায় দলপতি। সবার সামনে যে,—সত্যিই সে দলপতি। সব কুকুরের চেয়ে শক্ত, কষ্টসহিষ্ণু আর বুদ্ধিমান তার হওয়া চাই। আর এও চাই সকলে যেন তাকে মান্য করে, ভয় করে। স্লেজটানা কুকুরের দলের দলপতি হতে দেরি হোলো না ফ্যাঙের।

সারাদিন সব কুকুরের আগে সে স্লেজ টানে। রাত্রেও ঘুমোয় না, সজাগ পাহারা দেয় প্রভুর সম্পত্তি। বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণ সে পরম বিশ্বাসভাজন হয়ে প্রভুর কর্তব্য করছে।

ম্যাট একদিন বলেই ফেললে,—কর্তা, সত্যি কথা বললে যদি না চটেন তো বলি,—রাম-ঠকান্ আপনি ঠকিয়েছেন বিউটি স্মিথকে। এ যা কুকুর,—দাম তো দিয়েছেন সিকির সিকি, তার ওপর আবার এক জোড়া ঘুসি।

বসন্তকালের শেষের দিকে এক মহা বিপদ হোলো হোয়াইট ফ্যাঙের। বলা নেই কওয়া নেই,—হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হোলো তার

প্রেমিক প্রভু। আগের দিন রাত্রে মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছিল, তা দেখে সে বুঝতে পারেনি যে তার প্রভুর অন্তর্ধানেরই এ প্রস্তুতি। সেদিন সারা রাত্রি সে প্রভুর আসার অপেক্ষায় কেবিনের বাইরে দোরগোড়ায় বসে রইল। সারারাত্রি কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝড় উঠল। টলতে টলতে কেবিনের পিছনদিকে দেয়ালের ধারে সে আশ্রয় নিয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ঝিমোতে লাগল—কান তার খাড়া রইল প্রভুর পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে। রাত্রি যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন তার দুশ্চিন্তা আর বাগ মানল না। শীত আর তুষার উপেক্ষা করে সে আবার কেবিনের সামনের দিকে গেল, দরজার কাছে গুঁড়ি মেরে পড়ে রইল প্রতীক্ষায়।

কিন্তু প্রভু এল না। সকাল বেলা ম্যাট যখন কেবিনের দরজা খুলল, হোয়াইট ফ্যাঙ তার দিকে করুণ জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাল। সে যা জানতে চায় ম্যাট কোন্ ভাষায় তা জানাবে! দিনের পর দিন কাটতে লাগল,—প্রভু নেই, প্রভু নেই। অসুখ কাকে বলে জীবনে জানেনি হোয়াইট ফ্যাঙ। এবার সে অসুখে পড়ল—কঠিন অসুখ। ম্যাট শেষ পর্যন্ত তাকে তুলে নিয়ে এসে কেবিনে শুইয়ে রাখল। স্কটকে সে চিঠিতে লিখল :

নেকড়েটাকে নিয়ে হয়েছে মহা বিপদ। ব্যাটা কাজ করবে না, খাবে না। এক ফোঁটা শক্তি নেই দেহে, সমানে অন্য কুকুরগুলোর মার খাচ্ছে। জানতে চায়, আপনি কোথায়। তা আমি কেমন করে তাকে বোঝাব? যা অবস্থা হয়েছে চেহারার, আর কদিন যে বাঁচবে জানিনে।

চিঠিতে অতিশয়োক্তি ছিল না একটুও। সত্যি জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না ফ্যাঙ, দলের যে কোনো কুকুর তাকে ঠ্যাঙায়,—মুখ বুজে সে সহ্য করে। ম্যাট যেদিন তাকে ঘরে তুলে আনল সেদিন থেকে সে উনুনের ধারে লুটিয়ে পড়ে থাকে দিনরাত। ম্যাট যখন তাকে ডাকে বা

ধমকায়, এক একবার মুখ তুলে ম্লান চোখ মেলে তার দিকে তাকায়, আবার সামনের পা দুটোর ওপর মুখ নামিয়ে পড়ে থাকে। ডাকতে ভুলে গেছে,—জীবনেই তার আসক্তি নেই।

একদিন রাত্রিবেলা ম্যাট আলোর কাছে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই পড়ছে, হঠাৎ সে চমকে উঠল ফ্যাঙের গলার আওয়াজে। আধা-নেকড়েটা চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। এক মুহূর্ত পরেই বাইরে পায়ের শব্দ,—দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল উইডন স্কট। ম্যাটের সঙ্গে করমর্দন শেষ করে স্কট জিজ্ঞাসা করল,—নেকড়েটা কোথায়?

অদূরে আগুনের কাছে তৃপ্ত-করুণ পুলক-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা,—ল্যাজ নাড়ছে আনন্দে, কিন্তু লাফিয়ে এসে পড়তে পারছে না প্রভুর গায়ে।

ম্যাট আনন্দে অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—দেখুন দেখুন, ব্যাটার কী স্ফূর্তি,—কেমন ল্যাজ নাড়ছে দেখুন! আর দেখুন কী দৃষ্টি!

স্কট এগিয়ে গেল। ডাক দিল ফ্যাঙকে। ফ্যাঙও প্রভুর কাছে এল এগিয়ে। মাটিতে উবু হয়ে বসে তাকে কাছে টেনে নিয়ে স্কট আদর করতে লাগল,—কপালে, কানের পিছনে, ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আস্তে আস্তে সারা শিরদাঁড়াটা টিপে দিতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙের গলা থেকে বার হতে লাগল আত্মপ্রসাদের ঘড় ঘড় শব্দ।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রভুর সঙ্গে পুনর্মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছে হোয়াইট ফ্যাঙ। এই আনন্দ তার সমস্ত মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, বুঝতে পারে না কেমন করে একে সে প্রকাশ করবে! হঠাৎ ফ্যাঙ প্রভুর হাতের ফাঁক দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে তার বুকের কাছে মুখ লুকোলো। সমানে চেপে ধরতে লাগল তার মুখ প্রভুর বুকের

মধ্যে,—শক্ত করে চোখ বুজে রেখে গলা দিয়ে সে বার করতে লাগল আকিঞ্চন-পূরণের অস্ফুট ধ্বনি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে স্কট আর ম্যাট কেবিনে বসে তাস খেলছে, হঠাৎ বাইরে থেকে কানে এল মানুষের গলার আর্তনাদ আর কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন।

চমকে উঠে ম্যাট বললে,—নেকড়েটা নিশ্চয়ই ধরেছে কাউকে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার আতংকভরা যন্ত্রণার আর্তনাদ।

একটা আলো নাও,—এই বলে স্কট দৌড়ল বাইরে।

আলো নিয়ে ম্যাট মালিককে অনুসর করল। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় তারা দেখল, মাটিতে বরফের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ, দুটি বাহু ভাঁজ করে শক্ত করে সে ঢেকে রেখেছে মুখ আর গলা। বুকের ওপর হোয়াইট ফ্যাঙ। উন্মত্ত আক্রোশে সে বারে বারে চেষ্টা করছে লোকটার গলাটা কামড়ে ছিঁড়তে। কাঁধ পর্যন্ত লোকটার জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি, সারা হাতদুটোতে অসংখ্য কামড়ের রক্তাক্ত ক্ষত।

স্কট ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্যাঙের ওপর। গলার বগলস ধরে সে তাকে টেনে সরাল। ধমকের পর ধমক দিয়ে সে বন্ধ করল তার ক্রোধান্ধ তর্জন গর্জন,—তার সাদা দাঁতের ঝলকানি।

ম্যাট লোকটাকে ধরে দাঁড় করাল সোজা করে। হাতদুটোকে ধরে নিচু করতেই বেরিয়ে পড়ল বিউটি স্মিথের কদর্য মুখখানা। লণ্ঠনের আলোয় হোয়াইট ফ্যাঙের দিকে চোখ পড়তেই স্মিথ আর-একবার আঁৎকে আর্ত চিৎকার করে উঠল।

ম্যাট দেখল কি দুটো জিনিষ মাটিতে পড়ে। লণ্ঠনটা নিচু করে জিনিষদুটোর দিকে পা বাড়িয়ে সে মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্কট দেখল,—কুকুর-বাঁধা একটি ভারি লোহার শিকল আর একটা কুঁদো লাঠি।

উইডন স্কট কোনো কথা বললে না, মাথা নাড়ল আবার। ম্যাট বিউটি স্মিথের কাঁধটা দুহাতে চেপে ধরে পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে সজোরে দিল একটা গলাধাক্কা।

হোয়াইট ফ্যাঙ তখনো মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠছে,—তার পিঠের খাড়া লোম আর নরম হতে চাইছে না। স্কট তার পিঠে থাবড়া মেরে মেরে তাকে প্রবোধ দিতে লাগল,—ধরতে এসেছিল তোকে, চুরি করতে এসেছিল, নারে? পারল না, নারে? আমার ফ্যাঙকে চুরি করা কি সোজা কথা? হারামজাদা খুব জব্দ হয়েছে, কি বলিস?

ঠিক বুঝেছে ফ্যাঙ। ঢাকা রাখতে গেলেও ঢাকা থাকেনি। মানুষ বড়ো চালাক, কিন্তু শ্বাপদ চালাক তার চেয়েও। কেমন করে সে ঠিক টের পায়। ইশারাটুকু যেখানে নেই,—সেখানে সে পায় ইশারার গন্ধ।

একদিন রাত্রে খেতে বসে ম্যাট বললে,—কর্তা, শুনতে পাচ্ছেন?

স্কট কান পাতলে। দরজাটার বাইরে অচেনা একটা শব্দ,—আকুল দীর্ঘশ্বাসের, বুকভাঙ্গা কান্নার।

ম্যাট আবার বললে,—এটাকে এড়ানো মুস্কিল হবে আপনার!

উইডন স্কট ম্লান মনমরা দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকাল। বললে,—তাতো বুঝলাম, কিন্তু কালিফোর্ণিয়ার মতো জায়গায় এমনি একটা বাঘা নেকড়ে নিয়ে গিয়ে কী করব বলো তো?

ম্যাট উত্তরে বললে,—ঠিকই তো, ঠিকই তো! ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি আপনার চলে?

উত্তরটা ঠিক পছন্দ হোলো না স্কটের, সে আবার বললে,—ধরো ওখানকার সহরে কুকুরগুলোকে ওটা তো ধরবে আর মারবে—আর খেসারত দিতে দিতে ফতুর হব আমি। তারপর একদিন পুলিসে টেনে নিয়ে যাবে, গুলি করে মেরে ফেলবে।

ঠিকই তো। কোথায় নিয়ে যাবেন খুনে ব্যাটাকে ?

চুপ করে খেতে লাগল স্কট। একটু পরে ম্যাট সুরু করলে,—যাই বলুন, কুকুরটা কিন্তু আপনার বড়ো ন্যাওটা।

ঠিক এই কথাটাই ভাবছিল স্কট। ঘা লাগল ঠিক আসল জায়গাটায়। গজ গজ করে বললে,—থামো থামো, প্যান্ প্যান্ করতে হবে না। আমি জানি আমি কী করব।

ম্যাট মুচকি হেসে বললে,—আপনার ভাবগতিক দেখে তো মনে হয় না তা !

স্কট গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর স্বীকার করল,—সত্যি ম্যাট, কুকুরটাকে নিয়ে কী যে করব, কিছুই বুঝছি নে।

একটু চুপ করে থেকে ম্যাট বললে,—কিন্তু আপনি যে যাবেন, সেটা ও ব্যাটা বুঝতে পারল কী করে বলুন তো কর্তা ?

মন-কেমন-করা গলায় স্কট বললে,—কী করে বলব ?

দিন এসে গেল। বাঁধা-ছাদা সুরু হয়েছে। কতো ভিড়, কতো লোকের আসা যাওয়ার দেখাশুনোর পালা। হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝতে পেরেছে, আর দেরি নেই। আবার প্রভু চলে যাবে কোথায়। এবারও তাকে সঙ্গে নেবে না। সে রাত্রে কেবিনের বাইরে বরফের ওপর বসে অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে সে কাঁদল,—সুদীর্ঘ কাতর কান্না। বারে বারে আকাশের নক্ষত্রদলের কাছে সে জানাতে লাগল তার দুঃখ।

কেবিনের মধ্যের লোক দুজন তখন সবেমাত্র গা মেলেছে।

ম্যাট বললে,—কর্তা, কুকুরটা আবার খাওয়া বন্ধ করেছে।

গম্ভীর গলায় হুঁ বলে স্কট কম্বল মুড়ি দিল।

গতবার আপনি যখন ছিলেন না তখন যা কাণ্ড করেছিল তাতে মনে হয় এবার আর ও বাঁচবে না।

কম্বলের অন্ধকার আড়াল থেকে স্কট ধমকে উঠল,—থামো তুমি, সমানে প্যান প্যান করছ। মেয়ে মানুষের বাড়া!

পরদিন হোয়াইট ফ্যাঙের দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। সে সমানে চোখে রাখল তার প্রভুকে,—প্রভু কেবিনের বাইরে যখনই বার হয়, সে তার পায়ে পায়ে ঘোরে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, প্রভুর বাক্স-বিছানা বাঁধা ছাদা তৈরী। দুজন ইণ্ডিয়ান এসে মোটঘাট মাথায় করে নিয়ে গেল তাও সে নিঃশব্দে লক্ষ্য করল। এরপর প্রভু তাকে ডাকল কেবিনের মধ্যে। হোয়াইট ফ্যাঙের কানের পিছনে আর পিঠের শিরদাঁড়ায় হাত বুলোতে বুলোতে ধরা গলায় স্কট বললে,—আমি অনেক দূরে চললাম রে, তোর সেখানে যাওয়া চলবে না। এখানে তুই থাকবি, ম্যাটের কাছে,—কেমন? দুঃখ কী? দুঃখ করিসনে বোকাটা,—ডাক্ তো? বেশ খুশি মনে ডাক্ দিকিন্ একবার!

হোয়াইট ফ্যাঙ ডাকল না। করুণ আর্ত দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে একবার তাকিয়ে তার বুকের কাছে মুখ লুকোলো।

এই সেরেছে! ম্যাট হাঁকল,—ও কর্তা, আর দেরি নয়, চলুন, চলুন! সামনের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিন। আমি পেছনের দরজা দিয়ে বার হচ্ছি।

দুদিকের দরজা বন্ধ হোলো। কেবিনের মধ্যে হোয়াইট ফ্যাঙ এতক্ষণে ডাকতে সুরু করল—বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল তার ক্লিষ্ট ব্যথিত আর্তনাদ।

স্কট বললে,—ম্যাট, ওটাকে আদর যত্ন কোরো। কেমন থাকে চিঠিতে জানিয়ো।

সে আর বলতে হবে না কর্তা! কিন্তু শুনুন তো,—ডুকরে ডুকরে কাঁদছে!

তাড়াতাড়ি পা চালাল স্কট।

জাহাজের নাম অরোরা। মেরু রাজ্য থেকে সভ্য জগতে পাড়ি দেবে। বোঝাই যাত্রী,—স্বার্থান্বেষী স্বর্ণসন্ধানীর দল। কেউ সফল, কেউ বিফল। একদা যেমন সবাই পাগল হয়ে এ রাজ্যে এসেছিল, এখন তেমনি সবাই ব্যাকুল ফিরবার জন্যে।

জাহাজ ছাড়বার দেরি নেই। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে স্কট আর ম্যাট শেষ বারের মতো করমর্দন করছে, হঠাৎ ম্যাটের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, শিথিল হয়ে গেল তার হাত। স্কট পেছন ফিরে দেখল, কয়েক গজ দূরে ডেকের ওপর বসে রয়েছে ফ্যাঙ, কাতর চোখে তাদের দেখছে।

আশ্চর্য গলায় ম্যাট বললে,—কর্তা,—সামনের দরজাটা তালা দিয়েছিলেন?

ঘাড় নেড়ে স্কট জিজ্ঞাসা করলে,—পেছনেরটা, তুমি?

আলবৎ।

হোয়াইট ফ্যাঙের কান খাড়া। কিন্তু নড়ছে না সে।

আবার ওটাকে নামাতে হবে আমাকে,—এই বলে ম্যাট এগোলো। পিছু হটল ফ্যাঙ। ম্যাট তাকে ধরবার জন্যে যতো দৌড়োয়, সে ততো চর্কি-পাক খায় যাত্রীর ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে,—ধরা দেয় না।

হাঁপিয়ে পড়ল ম্যাট। শেষ পর্যন্ত ডাক দিল স্কট। সে ডাক শুনে আর দ্বিধা নেই, দৌড়ে এসে প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল ফ্যাঙ।

হাঁপাতে হাঁপাতে ম্যাট ফোঁস ফোঁস করে উঠল,—ব্যাটা, কার হাতে খেয়েছিলে এতদিন? উঁ, আমাকে চিনতে পারো না,—আর কর্তা ডাকলেই সুড় সুড় করে এসে পায়ে মুখ ঘসো! নেমকহারাম কোথাকার!

হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে স্কট দেখাল হোয়াইট ফ্যাঙের নাক-মুখভর্তি একগাদা নতুন কাটা-ছেঁড়ার দাগ।

এইবার বুঝতে পেরেছি, ম্যাট বলে উঠল,—জানালাটার কথা মনে পড়েনি। ব্যাটা জানালার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল, কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো করে গরাদে ঠেলে পালিয়ে এসেছে। কী ভয়ানক কাণ্ড!

জাহাজের শেষ ভোঁ বাজছে। লোকে দৌড়ে তীরে নামছে। ম্যাট গলার রুমালটা খুলে ফ্যাঙের গলায় বাঁধতে গেল। হঠাৎ তার হাত চেপে ধরল স্কট।

থাক, থাক! আর এটার কথা আমাকে লিখতে হবে না তোমাকে। আমি ঠিক করলাম—

লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল ম্যাট, নিজেও মনিবের হাত চেপে ধরে বললে,—তাহলে কর্তা, এটাকে আপনি—

হ্যাঁ, এটাকে আমি নিয়েই চললাম সঙ্গে। নাও তোমার রুমাল। কেমন থাকে আমিই তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।

বন্দর থেকে জাহাজ ভাসল। উইডন স্কট রুমাল নেড়ে শেষ বিদায় নিল তার তুষার-রাজ্যের সহচরের কাছ থেকে। তারপর সে হোয়াইট ফ্যাঙের দিকে তাকাল। তার মাথায় আদরের চাপড় মারতে মারতে বললে,—চেঁচা ব্যাটা,—চেঁচা, প্রাণভরে তুই চেঁচা এইবার,—দেখি, কতো ডাক তুই ডাকতে পারিস হতভাগা!

সভ্যতার নীড়

নতুন রাজ্য

জাহাজ থেকে হোয়াইট ফ্যাঙ নামল সানফ্রানসিস্কোতে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল বুনো বেচারা। ছেলেবেলা থেকেই সে বুঝতে শিখেছিল, সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকারী মানুষ,—তার ধ্যানে যে দেবতা। কিন্তু সেই শক্তি এত বিরাট, এমনি অনির্বচনীয়? তাকে সবচেয়ে অবাক করল মানুষের তৈরী বিরাট বিরাট বাড়ি আর বিচিত্র রকমের গাড়ি। তুষার রাজ্যে তাঁবু আর কেবিন-ঘর সে দেখেছে—তাজ্জব হয়ে গেল শহরের আকাশচুম্বী অট্টালিকা দেখে। আর কী চওড়া চওড়া পাকা রাস্তা—সেই রাস্তায় পদে পদে বিস্ময় আর বিপদ,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারার বিভিন্ন রকমের গাড়ি—এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে অদ্ভুত পথ-কাঁপানো প্রচণ্ড-গতি ইলেকট্রিক গাড়িগুলো—সর্বদা ছুটছে বিদ্যুৎ-বেগে, আর তীব্র খন্‌খনে আওয়াজে ভয় দেখাচ্ছে সাবধান হচ্ছে,—ঠিক সেই বন-নেউল যেন।

বস্তু জগতের প্রতিটি বিচিত্র সৃষ্টি শক্তিরই রূপান্তর। আর এই শক্তি মানুষের—বস্তুর ওপরে যার একচ্ছত্র রাজত্ব।

এই বিরাট বিচিত্র বিভ্রান্তিকর সভ্যতার মাঝখানে হঠাৎ অবতীর্ণ হয়ে ফ্যাঙ নিরুপায় ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠল, আরো নিবিড় হয়ে উঠল প্রেমিক প্রভুর প্রতি তার নিঃসহায় বশ্যতা।

শহরে এই অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা একদিনের বেশী তাকে সইতে হোলো না। প্রভু তাকে একটা মাল-বোঝাই মোটর গাড়িতে তুলে এককোণে বেঁধে রাখল। যখন সে গাড়ি থেকে নামল, তখন কোথায়

মিলিয়ে গেছে দুঃস্বপ্ন। মাল বোঝাই চলমান ঘরের মধ্যে সে আটক ছিল, দূরাক্রান্ত হয়েছে সশব্দ শহর। সামনে মধুর অলস পল্লীগ্রাম সুখের আলোয় ঝিমোচ্ছে। যে দিকে তাকাও সবুজের মেলা, পরিচ্ছন্ন প্রশান্তি! কী করে সম্ভব হোলো? দেবতারা সব পারে,—বিচিত্র দেবতার লীলা!

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি। ফ্যাঙ দেখল, প্রভুর সামনে এগিয়ে এল একজন পুরুষ ও এক মহিলা। মহিলাটি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার প্রভুকে। কী? তার প্রভুর গায়ে হাত?

মুহূর্তে উইডন স্কট আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন ফ্যাঙের ওপর। গলার বগলস চেপে ধরে মাটিতে তার মাথা নুইয়ে স্কট বলতে লাগল,—ভয় নেই মা, ভয় নেই। ভেবেছিল তুমি আমাকে মারছ, তাই। দুদিনে সব শিখে নেবে।

হোয়াইট ফ্যাঙ তখনো দাঁত বার করে স্কটের মা-র দিক হিংস্র চোখে তাকিয়ে গর্জন করছে। আতংকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে মহিলার মুখ। তিনি তবু মুখে হাসি টেনে বললেন,—ভ্যাখো! ছেলেক একটু আদর করব, তাও ছেলের কুকুরের আড়ালে না করলে চলবে না?

না না, শিখতে এর একটুও দেরি হবে না।—চুপ, চুপ, মাথা নিচু কর্। থাম্, থাম্ শিগগির!—এবার এস মা।

মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল স্কট, কিন্তু তার নজর রইল কুকুরের ওপর। মাঝে মাঝে ধমকাতে লাগল,—শুয়ে থাক্, শুয়ে থাক্ বলছি চুপ করে।

হোয়াইট ফ্যাঙ পিঠের লোম খাড়া করে গুঁড়ি মেরে শুয়ে দেখতে লাগল মাতাপুত্রের আলিঙ্গন। কই, প্রভুর কোনো ক্ষতি হোলো না তো?

অচেনা দেবতা দুজনের সঙ্গে প্রভু গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়ল। গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগল ফ্যাঙ। মিনিট

পনেরো পরে গাড়ি ঢুকল মস্ত একটা গেটের মধ্যে। চওড়া রাস্তার দুধারে ছায়া-ঝরানো আখরোট গাছের সারি, দুপাশে সুন্দর সবুজ ঘাসের প্রান্তর, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ওক গাছ। অদূরে সূর্যজ্বলা সোনালি খড়ের মাঠ। তার পিছনে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র পাহাড়ের সানুদেশে গিয়ে মিশেছে। একটু আগে সামনেই উঁচু জায়গার ওপরে মস্ত বড়ো বাড়ি।

এসব ভালো করে দেখবার সুযোগ পেল না হোয়াইট ফ্যাঙ। গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই একটি মস্ত চেহারার লম্বা দেঁতো ভেড়া-চরানো কুকুর গোঁ গোঁ করে তেড়ে এল তার দিকে। হোয়াইট ফ্যাঙও নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাড় ফুলিয়ে। একটি মরণ কামড়ের ওয়াস্তা। কিন্তু হঠাৎ সে থামিয়ে নিল নিজেকে ;—নিজের থেকেই প্রচণ্ড বেগ সংবরণ করবার জন্যে সে প্রায় বসে পড়ল মাটিতে। ঈস্, কুকুরটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যেন না হয়! আরে, ওটা যে মাদী! মাদীর সঙ্গে লড়াই করা তার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ যে!

কিন্তু মাদী কুকুরটার এমন কোনো নিষেধ নেই। তা ছাড়া ভেড়া চরানো তার পেশা, বন্যের প্রতি শত্রুতা তার রক্তে। কতো কাল ধরে তার পূর্ব-পুরুষরা পশুপালনের সহচর,—আর অরণ্যচারী যে-সব নেকড়ের দল বংশানুক্রমে মানুষের আস্তানায় এসে গৃহপালিত পশুদের নিগ্রহ করে, চুরি করে নিয়ে যায়,—তাদেরই প্রতিভূ এই আধা-নেকড়েটা। তাই হোয়াইট ফ্যাঙ তাকে আক্রমণ না করলেও মাদী কুকুরটা তাকে ছেড়ে দিল না।

গাড়ির অপর পুরুষটি ডাক দিলেন,—কলি, এই কলি!

স্কট হেসে উঠল ব্যাপার দেখে। বললে,—থাক্ না বাবা! হোয়াইট ফ্যাঙকে অনেক কিছু শিখতে হবে। এই তো শিক্ষার সুরু। . . . .

গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। ফ্যাঙের সামনে কলি। কিছুতেই তাকে এগোতে দেবে না। ফ্যাঙ যতোই দৌড়ে দৌড়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করুক, কলির বাধা আর তার তীব্র দংষ্ট্রার আঘাত কিছুতেই এড়াতে পারে না। পিছন ফিরে রাস্তা ছেড়ে সে মাঠের মধ্যে দৌড় দিল, কলি তাকে অনুসরণ করল।

গাড়ি ছুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে বৃক্ষশ্রেণীর পিছনে। এখনি প্রভুর সঙ্গছাড়া হবে সে। অবস্থা সঙ্গীন। মাঠের মধ্যে বৃত্তাকারে একবার দৌড় দিল ফ্যাঙ। কলিও ছুটল পিছনে। তারপর সে অবলম্বন করল লড়াইএর পুরোনো একটা কৌশল। হঠাৎ ধাঁ করে পিছন ফিরে জোড়া কাঁধ দিয়ে কলির কাঁধে লাগাল প্রচণ্ড এক ধাক্কা। কলি উল্টে পড়ল, মাঠের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাথর কুচির ওপর পড়ে সে থামল। কামড় নয়, আঁচড় নয়, শুধু ধাক্কাতেই এই? আহত কাঁধের বেদনায় সে ককাতে লাগল তারস্বরে।

ইতিমধ্যে সোজা দৌড় দিয়েছে ফ্যাঙ সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি লক্ষ্য করে। কান্না থামিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল কলি। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল হোয়াইট ফ্যাঙের পিছনে। কিন্তু পারবে কেন? সে যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, হোয়াইট ফ্যাঙ তখন যেন বাতাসের হিল্লোলের মতো উড়ে যায়।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। আরোহীরা নামছে। পূর্ণ বেগে দৌড়ে আসতে আসতে হঠাৎ হোয়াইট ফ্যাঙ অনুভব করল, পাশ থেকে নতুন একটা আক্রমণ ঘনিয়ে এল বলে। ডানদিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে তেড়ে আসছে একটা ডিয়ার-হাউণ্ড। দৌড় থামিয়ে সেটার দিকে মুখ ফেরাবার আগেই সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্যাঙের পাঁজরের ওপর। ফ্যাঙ ছিটকে পড়ল মাটিতে। পরমুহূর্তেই সে রাগে অন্ধ হয়ে ধারালো দাঁত বার করে লাফ দিল হাউণ্ডটার গলা লক্ষ্য করে।

সাংঘাতিক এই আক্রমণ। একবার গলার নলীতে দাঁত বসাতে পারলে আর রক্ষা থাকত না হাউণ্ডটার। কলি তাকে বাঁচাল। ঠিক মরণ-কামড়ের মুখে সে এসে পৌঁছল, এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল ফ্যাঙকে। ফ্যাঙ ডিয়ার-হাউণ্ডকে আক্রমণ করলেও মাদী কলিকে তো কামড়াতে পারে না! তাই কুকুরটা বেঁচে গেল সে যাত্রা।

পরমুহূর্তেই ছুটে এসে হোয়াইট ফ্যাঙকে চেপে ধরল স্কট। তার বাবাও অন্য কুকুরগুলোকে সরিয়ে নিলেন।

বাড়ির মধ্যে থেকে আরো দুজন মহিলা বাইরে এসে স্কটকে আলিঙ্গন করলেন। এ দৃশ্যটা হোয়াইট ফ্যাঙএর অভ্যস্ত হয়েছে। এবার সে লাফাল না, মুখ গোঁজ করে বসে খালি গোঁ গোঁ করতে লাগল।

একজন মহিলা কলিকে জড়িয়ে তাকে আদর করছেন। ফ্যাঙকে ধরে আছে স্কট। হাউণ্ডটা আবার গর্ গর্ করছে, তড়পাচ্ছে। স্কটের বাবা দু-একবার তাকে ধমক দিচ্ছেন,—চুপ ডিক্, চুপ।

বাড়ির ভেতরে ঢোকবার আগে স্কটের বাবা প্রস্তাব করলেন,—কলিকে ভেতরে নিয়ে যাও। বাকি কুকুরদুটো প্রাণভরে লড়াই করে নিক। লড়াই করলেই তবে এ দুটো বন্ধু হবে।

হাসতে হাসতে স্কট বললে,—থাক, থাক, বন্ধুত্বে আর কাজ নেই। ও কর্মটি করবেন না বাবা! সর্বনাশ!

কর্তা অবিশ্বাসভরা চোখে একবার ফ্যাঙের দিকে আর একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,—তার মানে?

স্কট বললে,—তার মানে, ডিকের প্রাণ বেরোতে দু' মিনিটও লাগবে না।

খানিকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে কর্তা ডিককে সরিয়ে দিলেন, ফ্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আয় ব্যাটা নেকড়ে,—তুই-ই ভেতরে আয়।

প্রভুর সংসার

উইডন স্কটের বাবা বিখ্যাত বিচারক। সারা সাণ্টা ক্লারা উপত্যকা জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তাঁর বাড়ি ও খাস সম্পত্তির নাম সিয়েরা ভিষ্টা। এইখানে এই সংসারের মধ্যে হোয়াইট ফ্যাঙ নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখতে লাগল। অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সে অভ্যস্ত, অভিজ্ঞতাও তার কম নয়। অন্য কুকুরদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ তার বিশেষ হয় না বললেই চলে। দু-একবার শক্তি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তারপর থেকে তারা তাকে মানে মানে এড়িয়ে চলে, সেও ভ্রূক্ষেপ করে না তাদের।

এক কেবল কলি ছাড়া। তার ওপর কলির প্রত্যক্ষ বিতৃষ্ণা। মুহূর্তে মুহূর্তে সে অনুভব করে,—এই জাত-নেকড়েই হচ্ছে ভেড়াদের যম, যে ভেড়া-চরানো তার কাজ। তাই কলি তাকে ছাড়ে না, নানা অত্যাচারে তার প্রতিমুহূর্তের জীবন উদ্ব্যস্ত করে তোলে। হোয়াইট ফ্যাঙ কখনো মাদীকে ছোঁবে না। তাই কলির সবচেয়ে সুবিধে। ফ্যাঙকে মারবার একটি সুযোগও সে ছাড়ে না, তার ঘাড় সে কামড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। হোয়াইট ফ্যাঙ নীরব ঔদাসীন্যে তাকে এড়াবার চেষ্টা করে। তাকে দেখলেই সে সরে পড়তে চায়। কিন্তু নিস্তার নেই; কলি কখনো হঠাৎ তার পিছন দিকে কামড় লাগায়, তখন আর গাম্ভীর্য বজায় থাকে না,—দৌড় দিতে হয় নির্লজ্জ অসভ্যতায়।

শিক্ষার শেষ নেই। মেরু-প্রদেশের জীবন ছিল যেমনি সরল, সিয়েরা ভিস্টার জীবন তেমনি সমস্যাসংকুল। কোথায় ইণ্ডিয়ানদের ছোট্ট তাঁবু, আর কোথায় মাঠ-বাগান-অট্টালিকা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে তার প্রেমিক প্রভুর এই সম্পত্তি! প্রথম তাকে চিনতে হয়েছে প্রভুর আত্মীয়দের।

পুরোনো প্রভু গ্রে বিভারের আত্মীয় সম্বল ছিল দুজন মাত্র ;—স্ত্রী আর ছেলে। এখানে ভিড় অনেক বেশী। বিচারক স্কট ও তাঁর স্ত্রী ; প্রভুর দুই বোন বেথ আর মেরী ; প্রভুর স্ত্রী অ্যালিস ও দুটি বাচ্চা উইডন আর মড—একজনের বয়েস ছয় বছর, আর একজনের চার। এরা তার প্রভুর বড়ো আপন, বড়ো আদরের জিনিষ। আর প্রভুর যা প্রিয়, তা তারও প্রিয়,—প্রভুর যারা ভালোবাসার পাত্র—তাকেও তাদের ভালো-বাসতেই হবে।

বিশেষ করে শিশু দুটি। ক্ষুদে দেবতাদের তার চিরদিন অপছন্দ। ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে সে দেখেছে, এই ক্ষুদে দেবতারাই সবচেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। প্রভুর ছেলেমেয়েরা যখন তাকে আদর করে, তখন নীরব আত্মসংযমে তা সহ্য করতে তাকে শিখতে হয়েছে অনেক কষ্টে। ক্রমে ক্রমে যা ছিল নিতান্ত নিরুপায় সহনশীলতা, তা মধুর ভালোবাসায় রূপান্তরিত হচ্ছে। বাচ্চা দুটি কাছে এলে আগ্রহে তার চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে, তাকে অবহেলা করে অন্য খেলায় যখন তারা মাতে, তখন তার মন কেমন করে ওঠে।

শিশু দুটির পরই সে সমীহ করতে শিখছে প্রভুর বাবাকে। তার কারণ দুটি। প্রথমত বিচারক যে তার প্রভুর সবচেয়ে ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র তা সে বুঝেছে। দ্বিতীয়ত তিনি তারই মতো উচ্ছ্বাসহীন। বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে যখন তিনি কাগজ পড়েন, তখন তাঁর পায়ের কাছে চুপ করে শুয়ে থাকতে ফ্যাঙের ভারি ভালো লাগে। কথা তিনি বলেন না, হাত বাড়িয়ে আদর করেন না, স্বধু মাঝে মাঝে নীরব দৃষ্টিতে ফ্যাঙএর উপস্থিতিকে তিনি যেন স্বীকার করে নেন এই আতিশয্যহীন স্বীকৃতি বড়ো ভালো লাগে ফ্যাঙের।

বলা বাহুল্য সবচেয়ে সে ভালোবাসে তার প্রেমিক প্রভুকে। প্রভুর সামনে এসে আর সবাইকে সে ভুলে যায়।

আইন কানুনের অন্ত নেই। মানুষের ভাষা সে জানেনা,—কিছুটা স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে কিছুটা দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সব আইনের সঙ্গে তাকে অভ্যস্ত হতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষা সে পায় প্রভুর হাতের চাপড়, প্রভুর রাগত স্বর থেকে। এই প্রভু তার প্রেমিক প্রভু,—গ্রে বিভার বা বিউটি স্মিথের বেদম প্রহার যতোটা লাগত, তার চেয়ে অনেক বেশি লাগে প্রেমিক প্রভু যদি বিরক্ত হয়ে একটিমাত্র চড়ও মারে। এই মারও কদাচিৎ সে খায়। প্রভুর গলাই যথেষ্ট। গলার আওয়াজেই সে ধরতে শিখছে তার কোন্ কাজটা ভালো আর কোন্ কাজটা অন্যায়।

মেরু প্রদেশে একমাত্র গৃহপালিত পশু ছিল কুকুর। বাকি যা জানোয়ার সব বন্য—শিকারী কিংবা শিকার। সাণ্টা ক্লারা উপত্যকায় পোষা প্রাণীর অভাব নেই। তাই এখানে পদে পদে ভুল, পদে পদে নতুন তালিম। এখানে যেদিন সে এসে পৌঁছল, তার পরের দিন ভোর-বেলাতেই বাড়ির বাইরে পা দিয়েই তার চোখে পড়ল একটা পোষা মুরগী। একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সেটাকে মারল। কেমন নরম মাংস, গরম রক্ত, মুচমুচে হাড়!

দুপুর বেলা আর একটা মুরগী দেখতে পেয়ে সেটাকে সে তাড়া করল। ঘটনাটা চোখে পড়তেই বাড়ির একটি ভৃত্য চাবুক হাতে তেড়ে গেল ফ্যাঙকে। এক ঘা পিঠে পড়তেই ফ্যাঙ আক্রমণ করল মুরগী ছেড়ে মানুষকে। চাবুকের দ্বিতীয় ঘা পড়তে না পড়তেই ফ্যাঙ ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার কণ্ঠনলী লক্ষ্য করে। লোকটা আতংকে হাত চেপে গলাটা ঢাকল,—একটিমাত্র অব্যর্থ কামড়ে সারা হাতটা জুড়ে মাংস চিরে হাড় বেরিয়ে পড়ল। এবারও ফ্যাঙের ওপর কলি ঝাঁপিয়ে পড়ে চাকরটার প্রাণ বাঁচাল। প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির মধ্যে পালাল লোকটা।

ঘটনাটা প্রকাশ হবার পর কদিন ধরে স্কট ভাবতে লাগল, কী করে ফ্যাঙকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়! দুদিন পরে এক রাত্রে মুরগীদের ঘরের ছাদের মাচা ভেঙে হোয়াইট ফ্যাঙ ঘরের মধ্যে ঢুকল। কলির ওপর পুরোণো রাগের ঝাল মেটাবার সুযোগ এবার হাতের মুঠোয়। আর তাকে পায় কে?

সকালবেলা চাকরেরা উঠে মুরগীর ঘর থেকে পঞ্চাশটা মরা মুরগী টেনে এনে বারান্দায় পাশাপাশি সাজিয়ে মনিবদের দেখাল। হোয়াইট ফ্যাঙও এসে দাঁড়াল সামনে। তার আচরণে লজ্জার বা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বরং গর্বে আত্মপ্রসাদে জ্বলজ্বলে তার চোখ। মস্ত শিকার সে যে করেছে সারা রাত্রি ধরে! দাঁতে দাঁত চেপে স্কট চেপে ধরল হোয়াইট ফ্যাঙের কলার। তার টুঁটিটা চেপে মরা মুরগীগুলোর ওপর সে তার মুখ ঘসে দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দু-কানের পিছনে কয়েক ঘা ঘুসি আর বেদম বকুনি।

দ্বিতীয় দিন আর হোয়াইট ফ্যাঙ পোষা মুরগী মারে নি। এ কাজ যে অন্যায়, আর কোনোদিন সে ভোলে নি। কদিন পরে একরাত্রে বাবার সঙ্গে বাজি ধরে উইডন স্কট হোয়াইট ফ্যাঙকে সারারাত মুরগীর ঘরে বেঁধে রাখল। সারারাত সে ঘুমল,—চারদিকে নরম মাংস জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ফিরেও তাকাল না সেদিকে। ভোরবেলা সে গম্ভীরভাবে ঢুকল বাড়ীর মধ্যে। বাড়ি ভর্তি লোকজনের সামনে ছেলের কাছে হার স্বীকার করলেন বিচারক স্কট, ফ্যাঙের মাথায় থাবড়া মেরে বললেন,—সত্যি, বাহাদুর বটে!

কিন্তু আইন কি এক রকম? কতো যে ঘোরপ্যাঁচ,—সব শিখে ওঠা কি সোজা নাকি? একদিন ফ্যাঙ দেখল, ডিক মাঠের মধ্যে একটা বুনো খরগোসকে তাড়া করেছে। প্রভু বারণ তো করলই না, বরং উৎসাহ দিল। এ আবার কি হলো? তাই তো! সব প্রাণীই তো

পোষ মানা নয়, ঘরোয়া নয়! সভ্যতার আওতায় এমন প্রাণীও আছে, দেবতা যাকে রক্ষা করে না, যে প্রাণী বন্য, অতএব বধ্য,—যে প্রাণীকে শিকার করলে প্রভু রাগ করে না। গৃহপালিত প্রাণীদের কামড়ালে চলবে না। ভালোবাসো আর নাই বাসো, দূরে দূরে রেখে খাতির করে চলতে হবে অন্তত। কিন্তু ঘরোয়া প্রাণীদের সংসারের বাইরে আছে কাঠ-বিড়ালী, নেউল, বন-মোরগ আর বন-খরগোস। তারা শিকারের খোরাক।

যা সহজ, বেপরোয়া মন যাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, সভ্যতা তাকেই বাঁধে বাধা-নিগড়ে। তাই এখানে ব্যবহারের ওপর নানা রীতিনীতির বন্ধন, অভ্যাসের ওপর সংযমের নানা কারুকার্য। যথেচ্ছাচার মানে আত্মবিকাশ নয়,—আত্মবিকাশ সংযত আত্মসচেতনতার পথে, সভ্য জীবনযাত্রায় তাই পদে পদে নানা বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে, এই বৈচিত্র্যের জালে উধাও অনুভূতিকে বেঁধে রাখতে হবে। যা-খুসি তা করা চলবে না, মনকে তৈরি করতে হবে যা-রীতির অনুশাসনে।

মাংসের দোকানে মাংস ঝুলছে, ছুঁলে চলবে না। প্রভুর সঙ্গে তাঁর কোনো বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে, সে বাড়ির বেড়াল কাছে ঘেঁষে ম্যাও ম্যাও করবে, থাবা ওঁচানো চলবে না। কুকুর তো একেবারে অস্পৃশ্য। পথে ঘাটে লোকজন তোমাকে দেখবে, ডাকবে, মাথায় থাবড়া দেবে! মুখ বুঁজে সইতে হবে ওসব অচেনা স্পর্শ। বোবা হলে চলবে না, লাজুক হলে চলবে না, একগুঁয়ে হওয়া মহা অপরাধ।

প্রভুর গাড়ির পেছনে পেছনে সে দৌড়োয়। পথের একটা বাঁকে একদল ছেলে তাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারে। রোজই দু-একটা ঘা লাগে, তবু সে কিছু বলে না, তেড়ে যায় না শিশু দেবতাদের দিকে। সভ্য হচ্ছে যে সে দিনে দিনে

সহিষ্ণুতার সীমা যখন সে প্রায় ছাড়িয়েছে, এমনি সময় একদিন প্রভু গাড়ি থামিয়ে চাবুক নিয়ে তেড়ে গেল দুষ্টু ছেলেগুলোর দিকে, জোরে কসাল ঘা কতক। শিক্ষা হোলো ছেলেগুলোর, খুসি হোলো হোয়াইট ফ্যাঙ। এই তো চাই! এ না হলে দেবতার বিচার!

আর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তার হোলো একদিন। শহরের পথে চৌরাস্তার মোড়ে একটা দোকানে তিনটে পোষা কুকুর থাকত। তাকে দেখলেই তারা একসঙ্গে তাড়া করত, আঁচড় কামড় লাগাত। প্রভুর শিক্ষা—কুকুরদের সঙ্গে লড়বে না। তাই ফ্যাঙ মুখ বুজে সহ্য করত। কিন্তু প্রভুর গাড়ির পেছনে শহরের পথে যাওয়া তার বিভীষিকা হয়ে উঠছিল। সে তর্জন গর্জন করে কুকুর তিনটেকে দূরে সরাবার চেষ্টা করত কিন্তু ভয় ভেঙে গিয়েছিল কুকুরগুলোর। দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাদের তার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখত।

একদিন হোয়াইট ফ্যাঙের পেছনে দোকানীরা কুকুর তিনটেকে লেলিয়ে দিয়েছে,—হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ফ্যাঙকে হুকুম দিল স্কট,—যা, ধর্ ওদের!

বিশ্বাসই করতে পারে না হোয়াইট ফ্যাঙ। ফ্যাল ফ্যাল করে একবার প্রভুর দিকে একবার কুকুরগুলোর দিকে তাকায়। প্রভু ঘাড় নাড়ল, চেঁচিয়ে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—যা না ব্যাটা, খেয়ে ফ্যাল্ ওগুলোকে!

আর দ্বিধা কী? ঘুরে দাঁড়াল সে। মুখোমুখি তিনটে কুকুর তার সামনে। তারপরেই উদ্দাম গর্জন, তীব্র আর্তনাদ, দাঁতের ঝলক আর ঝটাপটি। রাস্তার ধুলোয় অন্ধকার হয়ে উঠল চারদিক। দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল লোকজন। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে দুটো কুকুর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে,

আর তৃতীয়টা দৌড়চ্ছে প্রাণের দায়ে। একটা খানার মধ্যে পড়ে সেটা পার হয়ে রেলের বেড়া টপকে হাঁসফাঁস করতে করতে মাঠের মধ্যে দৌড়ল কুকুরটা, একলাফে খানা আর বেড়া একসঙ্গে টপকে নিঃশব্দে বাতাসের গতিতে তাকে অনুসরণ করল ফ্যাঙ। মাঠের মধ্যে কুকুরটাকে ধরে সে সেটাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলল, পরমুহূর্তে অব্যর্থ একটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল তার শ্বাসনলী।

চিনল সবাই হোয়াইট ফ্যাঙকে। তার নাম ছড়িয়ে গেল সারা অঞ্চল জুড়ে। এর পর থেকে সবাই সন্ত্রস্ত,—কার কুকুর কোন্ দিন বাঘা নেকড়েটাকে ঘাঁটাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দেবে!

... ...

দিনের পর দিন কাটছে, মাসের পর মাস। প্রচুর সুখাদ্য, কর্মহীন নিশ্চিন্ত অবসর। মোটা হচ্ছে ফ্যাঙ,—প্রাণ সর্বদা ভরপুর।

এখনো অন্য কুকুরদের সঙ্গে কিন্তু তার আড়ি। তাদের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। কী করা উচিত আর কী উচিত নয়, তার বোধ সকল কুকুরের চেয়ে তার বেশি, তবু তার মধ্যে কোথায় রয়েছে বন্যতার আভাস। তার মধ্যেকার ভয়াল নেকড়েটা মরেনি, তার সমস্ত বর্বরতা নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মাত্র। তাই অন্য কুকুরেরা তার কাছে ঘেঁসে না। সে চিরকালের একলা—আগেও যেমন ছিল নির্বান্ধব, এখনো তেমনি। শিশুকাল থেকে স্বজাতি কুকুরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে শত্রু বলে সে জেনে এসেছে। এখনো তাই। কুকুরকে সে ভালোবাসে না। সব ভালোবাসা সে সঁপেছে মানুষের পায়ে।

কলিকে কিন্তু সামলানো দায়। উল্টে ও এক মুহূর্তের শান্তি তাকে দেয় না। কলির তীক্ষ্ণ সচকিত গর্জন সর্বদাই তার কানে বাজে। মুরগী মারার ঘটনার পর থেকে কলি প্রতি মুহূর্তকাল তাকে চোখে

চোখে রাখে, তার পেছনে পেছনে ঘোরে। সে যদি কখনো বা একবার একটা মুরগী বা পায়রার দিকে ভুলেও চোখ তুলে চায়, অমনি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। তার পক্ষে কলির দুর্বিসহ অত্যাচারকে এড়াবার একমাত্র উপায় মাটিতে শুয়ে সামনের দু-পায়ের থাবার ওপর মুখ ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা। এমনি অবস্থায় কী করবে কলি ভেবে পায়না, সেও খানিকটা নিস্তার পায়।

এক কলি ছাড়া ফ্যাঙের জীবনে আর কোনো দুঃখ নেই। রক্তের দুর্দাম চঞ্চলতা তার শান্ত হচ্ছে, মনের জ্বালাধরা হিংসা রূপান্তরিত হচ্ছে প্রশান্ত প্রসন্নতায়। আতংক-ভরা অজানা জীবনের আশেপাশে আর ঘোরে না,—হঠাৎ-শত্রুর জন্যে তৈরি থাকতে হয় না জিঘাংসার বর্ম পরে। সহজ জীবন—পাহাড়ী বন্যার স্রোত নয়, নদীর জোয়ার। মনের মধ্যে কোথায় কেবল কেমন একটা অজানা ক্ষোভ লুকিয়ে থাকে—শীতের জন্যে, তুষারের জন্যে। গ্রীষ্মকালে কষ্ট হয়, বুঝতে পারে না কেন; কী যেন হারিয়েছে,—তার জন্যে সুধু হঠাৎ হঠাৎ মন কেমন করে ওঠে।

আজকাল প্রভুর হাসিকে উপভোগ করতে সে শিখেছে, নিজেও শিখেছে হাসতে। অল্প একটু হাঁ করে ঠোঁটগুলো অল্প একটু কুঁকড়ে মুখে কেমন অদ্ভুত একটা ভাব সে আনে—সেই হোলো তার হাসি। প্রভুর সঙ্গে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতেও সে শিখেছে। প্রভু খেলা করতে করতে তাকে উল্টেপাল্টে ফেলে, সেও রাগে গর গর করে দাঁত বার করে তেড়ে যায়, কামড় লাগায় প্রভুর হাতে। এ কিন্তু মিথ্যে লড়াই, ঝুটো রাগ,—খেলার কামড়। এমনি লড়াইএর খেলা ফ্যাঙ কিন্তু আর কারো সঙ্গে খেলে না। এ খেলা সে রেখেছে সুধু তার প্রেমিক প্রভুর জন্যে। সকলকে সমানভাবে বিলিয়ে তার ভালোবাসাকে তুচ্ছ করতে সে রাজি নয়।

উইডন স্কট প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করত। এমনি ভ্রমণে প্রভুর সাথী হওয়া হোলো হোয়াইট ফ্যাঙের প্রধান কর্তব্য। এখানে তার আর স্লেজ টানার কাজ নেই, এর বদলে প্রভুর ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়নোর কাজ ফ্যাঙ লুফে নিল। এতে পেল প্রভুর কাছে আত্ম-নিবেদনের মস্ত সুযোগ।

একদিন মাঠের মধ্যে দিয়ে স্কট ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, সঙ্গে দৌড়ে চলেছে হোয়াইট ফ্যাঙ। হঠাৎ ঘোড়াটার সামনের পায়ের তলা দিয়ে একটা বুনো খরগোস লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল, ঘোড়াটা ভয় খেয়ে দারুণ বেগে লাফিয়ে উঠল, অসামাল আরোহী ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা পা মচকে গেল স্কটের, ওঠবার ক্ষমতা তার রইল না। ঘোড়াটার ওপর রাগে আগুন হয়ে ফ্যাঙ তাকে কামড়াবার জন্যে লাফাতে লাগল। স্কট চিৎকার করে তাকে কাছে ডাকল। নিজের পায়ের আঘাতের গুরুত্ব পরীক্ষা করে ফ্যাঙকে হুকুম দিল, -যা, বাড়ি যা! বাড়িতে গিয়ে খবর দে!

হোয়াইট ফ্যাঙ আহত প্রভুর কাছ থেকে নড়তে রাজি নয়। স্কটের পকেটে কাগজ পেন্সিল নেই যে একটুকরো চিঠি লিখেও নিজের অবস্থাটা জানাবে। কাতর গলায় সে ফ্যাঙকে বললে,—দেরি করিস নে, যা, যা!

করুণ চোখে প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে দু-পা এগিয়েই ফ্যাঙ আবার ফিরে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়া প্রভুর গা ঘেঁসে সে ঘুরতে লাগল, মুখ দিয়ে বার করতে লাগল অস্ফুট কান্নার আওয়াজ।

স্কট তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল,—আরে মন খারাপ করছিস কেন বোকা? ছুটে বাড়ি যা! তোকে দেখলেই তো সবাই বুঝবে আমার কী হয়েছে! তুই ছাড়া এখন খবর দেবার কে আছে বল্ তো? যা,

যা। আঃ, আরে আমি ঠিক থাকব। পালা, পালা তুই, দেরি করে না এখন !

ঠিক বুঝতে পারল হোয়াইট ফ্যাঙ। ঠিক ধরতে পারল প্রভুর আদেশ। প্রভুকে এমনি বিপদে একলা ছাড়তে তার মন সরে না, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ছুটল।

সারা পথ তীরবেগে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাঙ যখন বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল, তখন গড়িয়ে এসেছে বিকেল। জিভ তার বেরিয়ে পড়েছে, সারা গা ধূলোয় ধূসর।

বাড়ির সবাই সামনের বারান্দায়। মা বললেন,—এতক্ষণে উইডন ফিরল।

প্রভুর ছেলেমেয়ে দুজন ছুটতে ছুটতে গিয়ে ফ্যাঙকে জড়িয়ে ধরল। ফ্যাঙ গর্জন করে উঠল, ধাক্কা দিয়ে তাদের মাটিতে ফেলে দুর্বার বেগে দৌড়ে উঠে এল বারান্দার ওপর। উইডনের স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে সন্তানদের ধরে তুললেন। উইডনের বাবা চিৎকার করে উঠলেন,—কী সর্বনাশ, দেখ নেকড়েটার কাণ্ড !

হোয়াইট ফ্যাঙ দৌড়ে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। দুচোখ তার জ্বলছে, গলা থেকে বার হচ্ছে চাপা গর্ গর্ ধ্বনি।

কর্তা হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করতে লাগলেন,—চুপ চুপ, শুয়ে পড়্, মাথা নিচু কর্।

কে শোনে সেই হুকুম ? কর্তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কটের স্ত্রীর ওপর। দাঁত দিয়ে তার পোষাকটা টানাটানি করতেই সেটা ছিঁড়ে গেল। কুকুরটার অস্বাভাবিক পাগলামি দেখে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে গর্ গর্ আওয়াজ বন্ধ করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে,—কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কণ্ঠনলী, কিন্তু কোনো শব্দ বার হচ্ছে না। সেই সঙ্গে থর্ থর্ করে কাঁপছে

তার সর্ব অঙ্গ। যে সংবাদের দূত হয়ে সে এসেছে, তা প্রকাশ করবে কেমন করে? সারা শরীর দিয়ে, প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে সে চেষ্টা করছে বলতে,—কিন্তু কোথায় পাবে সে ভাষা?

উইডনের মা বললেন,—নিশ্চয়ই কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম গরম দেশ এটার সইবে না!

ভগ্নী বেথ বললে,—না মা, দেখছনা, কী যেন বলতে চায়!

ঠিক এই মুহূর্তে গলা ফুটল ফ্যাঙের। যে ডাক সে জীবনে কখনো ডাকেনি, সেই ডাক সে ডাকল। কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দ বার হোলো তার কণ্ঠ থেকে।

তার গলায় এমন ডাক কেউ কখনো শোনে নি। জীবনে এমনি ডাক সে ডাকল এই প্রথম আর শেষ বার। উইডনের স্ত্রী বললেন,—শুনছেন কেমন করে ডাকছে আমাদের? নিশ্চয়ই উইডনের কোনো বিপদ হয়েছে।

ত্বরিত গতিতে এগিয়ে চলল ফ্যাঙ। তাকে অনুসরণ করে ছুটে চলল সবাই।

দিন চলেছে,—সোনালি দিন, অলস মন্থর দিন। ক্রমে গরম কাটল, রাত্রি বড়ো হতে লাগল,—এল আবার শীতকাল। এমনি সময়ে আশ্চর্য একটা আবিষ্কারে চমকে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ। কী কাণ্ড! কলির দাঁতে তো আজকাল আর ধার নেই! কামড়ায় সে আগের মতোই সময়ে অসময়ে,—কিন্তু আঘাত করতে চায় না। কামড় দিয়ে সে যেন ঠাট্টা করতে চায়, খেলা করতে চায়। উগ্র শত্রুতা উধাও হয়েছে,—তার বদলে মধুর সখ্যতা। এ আবার কেমন ধারা? যতো লক্ষ্য করে, ততোই সে অবাক হয়। নিজেও চেষ্টা করে মিতালি করতে, খেলা করতে কলির সঙ্গে,—কিন্তু সে যে একটা গুরুগম্ভীর

জবরদস্ত নেকড়ে,—ক্ষণে ক্ষণে নিজের ছেলেমানুষির প্রশ্রয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

একদিন বিকেলবেলা খেলার ছলে আকর্ষণ করতে করতে কলি তাকে নিয়ে চলল অনেক দূরে,—বাড়ির পেছনদিকের শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে। প্রথম কিছুটা ইতস্তত করল ফ্যাঙ। সে জানে প্রভু এখনি বার হবে ভ্রমণে, ঘোড়া সাজানো হচ্ছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে কী নতুন একটা উচাটন,—কীসের আহ্বান,—যার কাছে অন্তত সেই সময়টুকুর মতো তুচ্ছ হয়ে গেল এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা, অভ্যাস, কর্তব্যবোধ। কলি তাকে একটা হাল্কা কামড় দিয়েই দৌড় লাগাল, ফ্যাঙ ছুটল তার পিছু পিছু। সেদিন প্রভুর সাথী হোলো না ফ্যাঙ, হোলো কলির সাথী। বনের মধ্যে দূর থেকে দূরান্তরে পাশাপাশি দৌড়ে বেড়াল সে আর কলি,—কতোদিন আগে একদিন উত্তর মেরুর নিস্তব্ধ অরণ্যপথে এমনি যেমন দৌড়ে বেড়িয়েছিল বুড়ো এক-চোখো আর কিচে।

তন্দ্রালু সকাল

সান কোয়েন্টিন জেলখানা থেকে একজন দুঃসাহসী কয়েদী পালিয়েছে : কাগজে কাগজে তারই লোমহর্ষক খবর। লোকটা সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ,—সমাজের একনম্বর শত্রু, পশুরও অধম। নাম জিম হল।

জেলখানার জীবন তাকে শোধরাতে পারেনি একটুও। কতো শাস্তি সে পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, তবু সে ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। মরবে মার খেয়ে, কিন্তু হার মেনে বাঁচতে রাজি নয়। দিনে দিনে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেছে তার মন।

মার, অনশন, ঠাণ্ডা গারদ ;—এই সে দিনে দিনে পেয়েছে। এতে শয়তান মানুষ হয় না,—শয়তানীই শুধু বেড়ে ওঠে।

এবার তৃতীয় দফায় জেল খাটছিল জিম হল। জুটেছিল এমন এক প্রহরী, যে পাশবিকতায় তারই সমান সমান। অত্যাচারে নিপীড়নে সে বন্দীশালার মানুষটাকে খাঁচার বাঘে পরিণত করে তুলল। এক হাতে তার চাবির গোছা আর এক হাতে টোটাভরা রিভলভার। জিমের হাত খালি। একদিন একটা অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল প্রহরীটার ওপর। দুহাত দিয়ে তাকে চেপে ধরে মাটিতে চিৎ করে ফেলে ঠিক জঙ্গলের শ্বাপদের মতো দাঁত দিয়ে তার গলার কাছটা কামড়ে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মারল।

এমনি অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের কথা কে শুনেছে? শিউরে উঠল সভ্যতা ; জিমকে দেওয়া হোলো জীবন্ত সমাধি। লোহার তৈরি 'সেল', মেঝে লোহার, ছাদ লোহার, লোহার চার দেয়াল। এর মধ্যে তাকে পুরে দেওয়া হোলো চিরদিনের মতো। সেলের মধ্যে সারাদিন প্রদোষের ধূসরতা, সারারাত্রি অমাবস্যার নীরন্ধ্র কালো। তিন বছর সে রইল

এমনি ভাবে। দেখল না মানুষের মুখ, শুনল না মানুষের কণ্ঠ। বাইরের গর্ত দিয়ে যখন তার কাছে খাবার ঠেলে দেয়া হোতো, পিঞ্জরাবদ্ধ জানোয়ারের মতো সে হুঙ্কার দিয়ে উঠত। কখনো সে দিনরাত এমনি গর্জন ছাড়ত, আবার কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে টুঁ শব্দও সে করত না, নিস্তব্ধ বসে বসে নিজের নারকী আত্মাকেই সে কামড়ে কামড়ে খেত। অর্ধোন্মাদ সে, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক দানব।

তিন বছর এমনি অন্ধ বন্দীত্বের পরে একদিন সে অসম্ভবকে সম্ভব করে পালাল। দেখা গেল, সেলের দরজা জুড়ে পড়ে রয়েছে একজন প্রহরীর মৃতদেহ। সেখান থেকে জেলের পাঁচিলের কাছ পর্যন্ত মৃতদেহ আরো দুজন শান্ত্রীর। এতগুলোকে স্রেফ হাতে খুন করেছে জিম হল।

মরা শান্ত্রীদের অস্ত্র-শস্ত্র তার হাতে। তার পালানোর খবর দিকে দিকে ছড়িয়েছে ;—তাকে ধরবার জন্যে ঘোষণা করা হয়েছে মোটা পুরস্কার। সহরে গ্রামে সর্বত্র তার খোঁজ হচ্ছে। তার কাটা পায়ের রক্তের গন্ধ ধরে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাল পাল ব্লাড-হাউণ্ড, তাকে শিকার করবার জন্যে গাদা-বন্দুক হাতে গ্রামে শহরে শিকারীর অভাব নেই। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, স্পেশাল ট্রেন, সভ্যতার এই সব দ্রুতসঞ্চারী উপকরণ তার পেছনে পেছনে ছুটেছে।

কয়েকবার মানুষের মুখোমুখি সে হয়েছে। খলখলে উন্মাদ হাসি হেসে সে সাবাড় করেছে অনুসরণকারীদের। গুলি বন্দুকের অভাব নেই তার, আর আছে সারা দুনিয়ার ওপর বুকজোড়া প্রতিহিংসা।

জিম হলের পলায়ন ও পরবর্তী রক্তাক্ত অভিযানের খবর সিয়েরা ভিষ্টার অধিবাসীদের ভাবিয়ে তুলেছে। বিশেষ ভয় পেয়েছে মেয়েরা, বিচারক স্কট ব্যাপারটাকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেও। জিম হলের বিচার করেছিলেন তিনি। তিনিই এবার তাকে জেলে

পাঠিয়েছিলেন। খোলা বিচারশালার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জিম হল শাসিয়েছিল,—দিন তার আসবে, হাকিমের ওপর চরম প্রতিহিংসা সে নেবে। মুখ দিয়ে তার ফেনা ঝরছিল, দাঁত কড় মড় করে হাকিমকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে আদালত থেকে সে ঢুকেছিল কারাগারের অন্ধকূপে। এতদিন পরে সে বেরিয়েছে।

হোয়াইট ফ্যাঙ কিন্তু এসব কিছুই বুঝতে পারেনি। তবে আজকাল অবশ্য গভীর রাতে সবাই শুতে যাবার পর দরজা খুলে প্রভুর স্ত্রী অ্যালিস ফ্যাঙকে বাড়ির মধ্যে এনে বাইরের ঘরে শুতে দেয়।

এমনি এক রাত্রে সারা বাড়ি যখন ঘুমে অচেতন, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ফ্যাঙের। মটকা মেরে সে পড়ে রইল, তার নাকে এল এক অজানা দেবতার উপস্থিতির অচেনা গন্ধ। কানে এল অজানা দেবতার গোপন পদধ্বনি। অজানা দেবতা এগোতে লাগল চুপি চুপি, তার চেয়েও চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করল ফ্যাঙ। সিঁড়ির কাছে এসে অজানা দেবতা থেমে দাঁড়াল,—কান পেতে শুনতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙও দাঁড়াল কয়েক পা দূরে,—অন্ধকারের অন্তরালে মড়ার মতো স্তব্ধ হয়ে। দোতলায় শুয়ে আছে তার প্রেমিক প্রভু আর তার আদরের ধনরা। সেই দিকে যাবে নাকি নতুন দেবতাটা? লোম খাড়া হয়ে উঠল ফ্যাঙের,—তবু তখনো সে নড়ল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করল লোকটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃশব্দ বিদ্যুতের গতিতে ফ্যাঙ তাকে আক্রমণ করল। এক লাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার পিঠের ওপর। সামনের নখের দুই থাবা দিয়ে লোকটার দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরে দাঁত বসাল তার ঘাড়ে। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উল্টে মাটিতে পড়ল। এক লহমায় দূরে ছিটকে সরে গিয়ে আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসাল।

বাড়ির সবাই চমকে জেগে উঠল। নিচে একতলায় কী ভয়ংকর গোলমাল,—সেখানে যেন দানবের লড়াই লেগেছে। মানুষ করছে আর্ত চিৎকার, কুকুর গর্জন করছে বাঘের মতো,—আসবাবপত্র পড়ছে, ঝনঝন করে ভাঙছে কাঁচ, মাঝে মাঝে রিভলভারের আওয়াজ উঠছে গুড়ুম গুড়ুম!

মিনিট তিনেক পরেই সব চুপচাপ। বাড়ির লোকেরা সন্ত্রস্ত পায়ে দোতলায় সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। নিচের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেমন একটা চাপা ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে, জলের বুদ্বুদের যেমন শব্দ ওঠে। তার পর সুধু শব্দ টানা দীর্ঘশ্বাসের।

উইডন স্কট হাত তুলে বোতাম টিপতেই সিঁড়ি আর নিচের হলঘর ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। তারপর পিস্তল হাতে সাবধানে সে নামল নিচে। বাবাও সঙ্গে এলেন। সাবধান হবার কিন্তু আর দরকার নেই। হোয়াইট ফ্যাঙ তার কর্তব্য করেছে। ভাঙা ওল্টানো একগাদা আসবাবের মাঝখানে হাতে মুখ ঢেকে মাথা গুঁজড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ। উইডন তাড়াতাড়ি এগিয়ে লোকটাকে চিৎ করে ফেলে হাত থেকে তার মুখটা সরাল। প্রাণহীন দেহ—সমস্ত গলা জুড়ে গভীর একটা ক্ষত।

হোয়াইট ফ্যাঙ পাশে পড়ে আছে এক কাত হয়ে, চোখ দুটো বন্ধ।

প্রভুর স্পর্শে ফ্যাঙ বৃথাই চেষ্টা করল চোখদুটো একবার খোলবার, ল্যাজটা নাড়বার। মুখ দিয়ে ক্ষীণ ঘড়ঘড় ধ্বনি একবার মাত্র বার করে সে চুপ করল সমস্ত শরীরটা যেন মিশে গেল মাটিতে।

উইডন বললে,—হয়ে গেছে বেচারার।

না, না,—বলে তার বাবা দৌড়লেন টেলিফোন করতে।

মুমূর্ষু ফ্যাঙকে নিয়ে দেড় ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর ডাক্তার বললেন,—আমার যা ক্ষমতা সব করলাম, কিন্তু এমনি অবস্থায় হাজারে কেন, দশ হাজারেও একটা বাঁচে কিনা সন্দেহ।

জানালা দিয়ে ভোরের আভা এসে ঢুকছে ঘরের মধ্যে, নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। ডাক্তারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই। তিনি বলতে লাগলেন,—পেছনের একটা পা গুঁড়িয়ে গেছে। পাঁজরা ভেঙেছে তিনটে। একটা ভাঙা পাঁজরা ঠেলে ঢুকেছে ফুসফুসের মধ্যে। এছাড়া আরো আঘাত তো আছেই। এক ফোঁটা রক্ত আর নেই শরীরে। তিন তিনটে গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে শরীরের মধ্যে দিয়ে। কোনো আশা আমি দেখতে পাচ্ছিনে।

স্কটের বাবা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ডাক্তারের দুহাত জড়িয়ে,—দেখুন, আশা থাক আর না থাক, চেষ্টার ত্রুটি যেন না হয়। এখুনি এক্স-রে করান। একটা টেলিগ্রাম করে সানফ্রানসিস্‌কো থেকে ডাক্তার নিকলস্‌কে আনিয়ে নিন বরং। খরচ যতো লাগে লাগুক!

ডাক্তার মৃদু হাসতে হাসতে বললেন,—নিশ্চয়ই, এ আর আমি বুঝিনে? এ যা করেছে—সব চেষ্টাতেও সে ঋণ শোধ দেওয়া যাবে না। খুব সাবধানে শুশ্রূষা করতে হবে। ঠিক যেমন মানুষকে, অসুস্থ শিশুকে সেবা করতে হয়। সে দিকটা নজর রাখবেন। এদিককার ব্যবস্থা আমি সব করব। বেলা দশটার সময় আবার আমি আসব।

মরলনা ফ্যাঙ। বাড়ির মেয়েদের প্রাণভরা অক্লান্ত সেবায় সে বাঁচল,—ফিরে এল নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে। আশ্চর্য করে দিল ডাক্তারদের। শহুরে প্রাণী তাঁরা দেখেছেন, তাদের ক্ষীণ জীবনীশক্তির অভিজ্ঞতা তাঁদের। তাঁরা কেমন করে বুঝবেন,—এ কুকুর যে-সে নয়, এ হোয়াইট ফ্যাঙ;—বজ্রের গাঁথুনি এর শরীরে,—অরণ্যের

আদিম প্রাণবন্যা এর রক্তে,—সারা জীবন ধরে জীবনকে জয় করে এ চলেছে—ভাগ্যের হাঁ-করা মুখ থেকে বারে বারে সে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে আপন অধিকার।

সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে আর প্ল্যাস্টারে বাঁধা, নড়বার চড়বার উপায় নেই। এমনি স্থাণু বন্দী হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল হোয়াইট ফ্যাঙের। এই সময়ে চুপচাপ পড়ে থেকে খালি লম্বা ঘুম সে দিত। স্বপ্ন দেখত সমানে। ঘুমের মধ্যে ভিড় করে আসত পুরোনো জীবনের কতো টুকরো ছবি। ফেলে-আসা দিনগুলি সারে সারে ভেসে উঠত তার মগ্নচৈতন্যের দর্পণে। আবার যেন সে কিচের কাছে অরণ্যগুহায়, আবার যেন সে আত্মসমর্পণ করেছে প্রথম প্রভু গ্রে বিভারের পায়ে, আবার যেন ছুটে আসছে লপ-লিপ আর তার দলবল। কখনো দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর দিন, কখনো আরো ভয়ংকর বিউটি স্মিথের উন্মাদ অট্টহাসি।

সবচেয়ে বিভীষিকা শহরের স্বপ্ন,—তীক্ষ্ণ আওয়াজ-করা ইলেকট্রিক ট্রেণের স্বপ্ন। ছায়ার অন্ধকারে ঘাপটি মেরে সে পড়ে রয়েছে, লক্ষ্য করছে সামনের ঝাঁকড়া গাছের গুড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালী কখন্ নামবে। যেই লাফিয়ে পড়েছে কাঠবিড়ালীটার ওপর, অমনি, কাঠবিড়ালী কই? চোখের সামনে খাড়া হয়েছে ইলেক্‌ট্রিক গাড়ি, প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে তাকে চাপা দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলতে। আকাশের বাজপাখি হঠাৎ ছোঁ মেরে মাটিতে নেমেই এক মুহূর্তে চেহারা বদলে ইলেক্‌ট্রিক গাড়ি হয়ে বিকট আওয়াজ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি! বিউটি স্মিথ নাকি খোঁয়াড়ের দরজা খুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে এমনি একটা গাড়িকে? এমনি বিভীষিকা সে স্বপ্নের মধ্যে ভিড় করে আসে হাজার বার—প্রত্যেকবারই আতংকে সে চমকে চমকে ওঠে, ঘুমটা ভেঙে গেলে রুদ্ধশ্বাস আতংকের কবল থেকে বাঁচে।

দুঃস্বপ্নের অন্ধ যুগ কাটল। একদিন হোয়াইট ফ্যাঙের গা থেকে শেষ প্লাস্টার আর শেষ ব্যাণ্ডেজটা খসিয়ে নেয়া হোলো। সেদিন উৎসবের দিন। সারা সিয়েরা ভিস্টা ভিড় করে দাঁড়াল তার চার দিকে। প্রভু এসে সামনে দাঁড়িয়ে তার কানের পেছনে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। প্রভুর স্ত্রী বললে,—ধন্য নেকড়ে। অন্য সবাই মেনে নিল কথাটা,—সকলে মিলে একসঙ্গে বললে,—ধন্য নেকড়ে।

পায়ের ওপর ভর দিয়ে ক-বার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ফ্যাঙ। পারল না। এক ফোঁটাও জোর নেই, মাংসপেশীগুলো নির্বীর্য শিথিল। লজ্জা হোলো তার। কর্তব্য যেন সে করতে পারছে না। অপরাধ করছে, হেরে যাচ্ছে। উঠে সে দাঁড়াবেই। প্রাণপণ চেষ্টায় চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে সে কোনো ক্রমে টলতে টলতে দাঁড়াল। আনন্দে কোলাহল করে উঠল সবাই।

সবচেয়ে গর্ব স্কটের বাবার। তিনি বললেন,—ছাখো, যা বলেছিলাম, —কুকুর নয় এ। এ যা করেছে, কুকুরের তা সম্ভবই নয়। ঠিক বলেছ তোমরা। এটা নেকড়ে।

স্কটের মা বললেন,—হ্যাঁ, তবে স্বধু নেকড়ে নয়, বল, 'ধন্য নেকড়ে'। আজ থেকে এই হলো ওর নতুন নাম।

ডাক্তার বললেন,—একটু একটু করে হাঁটান ওকে। পায়ে পায়ে বাইরে নিয়ে যান।

ধীর মন্থরগতিতে বাইরে চলল ফ্যাঙ। যেন রাজা চলেছে। পেছনে পাশে তাকে ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার প্রিয় দেবতার দল। শোভাযাত্রা যেন। সামনের মাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। রক্তচলাচল তরঙ্গিত হচ্ছে শিরায়

শিরায়,—পেশীতে পেশীতে জেগে উঠছে নতুন শক্তি। নতুন জীবনে ফ্যাঙ ফিরে এসেছে।

আস্তাবলের মুখে শুয়ে আছে কলি। তাকে ঘিরে তার চারদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছে ছটা কুকুর বাচ্চা।

হোয়াইট ফ্যাঙ বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগল।

কলি দাঁত বার করে গর্ গর্ শব্দ করে তাকে সাবধান করে দিল,—খবরদার, আর এগোবে না। প্রভু একটা কুকুরবাচ্চাকে পা দিয়ে তার দিকে ঠেলে দিল। সন্দিগ্ধচোখে কলি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সাবধান, আমার বাচ্চাকে মারলে কিন্তু রক্ষা থাকবে না।

বাচ্চাটা ফ্যাঙের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সে কান খাড়া করে দেখতে লাগল ওটাকে, আস্তে আস্তে মুখটা এগিয়ে দিতে লাগল। ক্রমে তার নাকটা ঠেকল বাচ্চাটার নাকে, জিভ বার করে আদর করে সে বাচ্চাটার গাল চেটে দিল।

তাদের ঘিরে সবাই আনন্দে হৈ-চৈ করছে। গর্ গর্ আওয়াজ করছে কলি, বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ফ্যাঙ। কতক্ষণ আর দাঁড়াতে পারে রোগা শরীরে? একটু পরেই সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপরে। বিশ্রাম তার চাই। সব পেয়েছে একটা জীবনে। সব অভিজ্ঞতা, সব পরিতৃপ্তি। এবার নতুন জীবন। বিশ্রাম ছাড়া আর কী তার পাবার আছে এই নতুন জীবনের আরম্ভে?

অন্য বাচ্চাগুলোও একে একে তার কাছে এল। ভয় কাটছে তাদের। ফ্যাঙেরও আড়ষ্ট ভাব কাটছে। বাচ্চাগুলো তার পিঠে, ঘাড়ে, সারা গায়ের ওপর উঠে লাফালাফি করতে লাগল। তাদের মাঝখানে চুপ করে শুয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ। গায়ে বাচ্চাগুলোর নরম স্পর্শ, কানে বাচ্চাগুলোর কিঁ কিঁ ডাক, সূর্যের উষ্ণ মধুর রোদ এসে পড়েছে দুর্বল অঙ্গে অঙ্গে। তন্দ্রায় জড়িয়ে এল ফ্যাঙের দু-চোখ।

অভ্যুদয়ের অনুবাদ

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ (২য় সংস্করণ) ২৲
দি ইনভিজিবল ম্যান—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ ১॥০
দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লড্‌স্—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ ২৲
দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ ২৲
এইচ্ জি ওয়েল্‌সের গল্প—সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৷৷০
দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন (২য় সংস্করণ) ১।০
দি গরিলা হাণ্টার্স—ব্যাল্যাণ্টাইন ১।০
দি ডগ ক্রুসো—ব্যাল্যাণ্টাইন ১৲
হোয়াইট ফ্যাঙ—জ্যাক লণ্ডন ২৲
নিকলাস নিক্‌ল্‌বি—চার্লস ডিকেন্স ১৲
দি ব্ল্যাক টিউলিপ্—এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা ১॥০
মাস্টারম্যান রেডি—ক্যাপ্‌টেন ম্যারিয়াট ১৲
দি চিলড্রেন অব্ দি নিউ ফরেস্ট—ক্যাপ্‌টেন ম্যারিয়াট ১।০
দি চ্যানিংস—মিসেস হেনরি উড ১॥০
অথই জলের রূপকথা—চার্লস কিংসলে ('দি ওয়াটার বেবীজ'এর অনুবাদ) ১॥০
পিনোশিয়ো—কার্লো কলোদি ১॥০
দি ইলিয়াড—হোমার ১৲